রুকূ, ২১ পারা।) যাহারা দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা পালন করে নাই তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ (اِلٰى قَوْلِهٖ) وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

অর্থাৎ "মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোক আছে যে, আল্লাহ্র সহিত এই বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল–যদি তিনি নিজ কৃপায় আমাদিগকে (ঐশ্বর্য) দান করেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সদকা করিব এবং অবশ্যই আমরা পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অনন্তর তিনি যখন তাহাদিগকে নিজ কৃপায় দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং পরান্মুখ হইয়া (স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতে) ফিরিয়া গেল। অনন্তর তাহাদের হৃদয়ে কপটতা সংযোগ করানো হইল, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করিবে। কারণ, তাহারা আল্লাহ্র সতিত যে-অঙ্গীকার করিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং (তৎসম্বন্ধে) তাহারা মিথ্যা বলিয়াছিল।" (সূরা তওবা, ১০ রুকূ, ১০ পারা।)

পঞ্চম বিষয়–অন্তরের ভাবের সহিত বাহিরের আচরণ সমান ও অনুরূপ রাখা। হৃদয়ে গাম্ভীর্য না থাকিলে যদি কেহ ধীরগম্ভীরভাবে চলে, সে সত্যবাদী নহে। ভিতর-বাহির সমান একই প্রকার রাখিতে পারিলে সত্যপরায়ণতা লাভ করা যায়। যাহার অন্তরের ভাব বাহিরের আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমান সমান তাহার মধ্যেই সত্যপরায়ণতা আছে। এইজন্যই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করিতেন–"ইয়া আল্লাহ, আমার বাহিরের আচরণ উৎকৃষ্ট কর এবং আমার অন্তরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া দাও।" যাহার অন্তর বাহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে, অথচ বলে ভিতর-বাহির সমান, ইহাতে রিয়ার উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাহার এই উক্তি মিথ্যা এবং সেই ব্যক্তি সিদ্দীক শ্রেণীর বহির্ভূত।

ষষ্ঠ বিষয়–যুহ্দ, তাওয়াক্কুল, খওফ, রযা (আল্লাহ্র রহমতের আশা), রেযা (আল্লাহ্র বিধানে সন্তুষ্টি), শওক (আগ্রহ(প্রভৃতি দীনের মকামসমূহের গূঢ় তত্ত্ব অন্তরে অনুসন্ধান করা এবং ইহাদের সূচনা ও বহির্ভাগ লইয়াই পরিতুষ্ট না থাকা। এই সদগুণরাজির কিছু না কিছু অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে;' তবে সকলের মনে বলবান হইয়া উঠে নাই। যাহাদের মনে ঐরূপ ভাব বা গুণ পূর্ণ বিকাশ পাইয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহারাই

সত্যপরায়ণ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (الى قوله) الصّٰدِقُوْنَ *

অর্থাৎ "মুমিন তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, তৎপর ইতস্তত করে নাই এবং আল্লাহর পথে স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করিয়াছে; তাহারা সত্যপরায়ণ।" (সূরা হুজুরাত, ২ রুকূ।)

ফলকথা, যাঁহাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগকেই আল্লাহ্ সত্যপরায়ণ বলিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, যে-ব্যক্তি ভয়ংকর কিছু দেখিয়া ভীত হইয়া থাকে, তাহার শরীর কম্পিত হয়, বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; পানাহার পরিত্যাগ করত সে অস্থির হইয়া পড়ে। আল্লাহ্কে কেহ এইরূপ ভয় করিলে ইহাতে সত্য ভয় বলে। যদি কেহ বলে 'আমি পাপকে ভয় করি', অথচ সে পাপ পরিত্যাগ করে না, তবে সে মিথ্যাবাদী। অন্যান্য মকাম সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচ্য।

উপসংহার–যাহা হউক, যে-ব্যক্তি ছয়টি বিষয়ের প্রত্যেকটি অবলম্বনে পূর্ণ সত্যপরায়ণ হইতে পারিয়াছেন তাঁহাকেই সিদ্দীক বলে। যে-ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অপর বিষয়ে পারেন নাই, তাঁহাকে সিদ্দীক বলা চলে না। তথাপি যে-ব্যক্তি যত বিষয়ে যে-পরিমাণে অধিক সত্যপরায়ণতা রক্ষা করিয়া চলেন তাঁহার মর্যাদাও তত অধিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাসাবা (কৃতকর্ম-পর্যালোচনা) ও মুরাকাবা

কিয়ামত দিবসে মানবের বিচার–আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا –

অর্থাৎ "ন্যায়বিচারের দাঁড়ীপাল্লা আমি কিয়ামতের দিন স্থাপন করিব; তখন কাহারও প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।" (সূরা আম্বিয়া ৪ রুকূ, ১৭ পারা।) কিয়ামত-দিবস স্বয়ং আল্লাহ্ পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন; কেহ রেণু পরিমাণ পাপ-পুণ্য করিলে তাহারও সূক্ষ্ম বিচার হইবে।

স্বীয় কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য মানবের প্রতি আদেশ–পাপ-পুণ্য বিচারের উপরিউক্ত অঙ্গীকারের পর মানবকে আদেশ দিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ –

অর্থাৎ "আর উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আগামী কল্যের (আখিরাতের) জন্য কি অগ্রে পাঠাইয়াছে, তাহা পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখ।" (সূরা হাশর, শেষ রুকূ, ২৮ পারা।) হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, বুদ্ধিমান লোক সময়কে চারি অংশে ভাগ করত এক অংশে স্বীয় কার্যের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করে, অপর অংশে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, অন্য এক অংশে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে আর অবশিষ্ট অংশে দুনিয়ার হালাল দ্রব্য উপভোগে নির্দোষ আরাম লাভ করে। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ

حَاسِبُوْا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا –

অর্থাৎ "কিয়ামত-দিবসে তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিবার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ কর।" আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا –

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর, একে অন্যকে ধৈর্যধারণে প্রবুদ্ধ কর এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক।" (সূরা আলে ইমরান, শেষ রুকূ, ৪ পারা।)

পারলৌকিক বাণিজ্যে প্রবৃত্তির হিসাব-নিকাশের উপায়–আরিফ বুযুর্গগণ ভালরূপে বুঝিয়াছেন যে, মানব এ-জগতে বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করিয়াছে এবং নফ্সের (প্রবৃত্তির) সহিত তাহার কাজ-কারবার। এই বাণিজ্যের লাভ বেহেশ্ত এবং লোকসান দোযখ; অর্থাৎ ইহাতে লাভ হইলে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে ও লোকসান হইলে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। বুযুর্গগণ স্বীয় নফ্সকে পারলৌকিক বাণিজ্যে অংশী করিয়া লইয়াছেন। পার্থিব ব্যবসায়ে যাহাকে অংশী করা হয়, তাহার সহিত যেমন সর্বাগ্রে কতকগুলি শর্ত করিয়া লওয়া হয় এবং তাহার আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, লাভ-লোকসানের হিসাব লওয়া হয় এবং ক্ষতি করিলে শাস্তি ও তিরস্কার করা হয়, তাঁহারাও নফ্সের সহিত তদ্রূপ ব্যবহারের জন্য ছয়টি উপায় নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। যথা ঃ– (১) মুশারাতা অর্থাৎ নফ্সের সহিত চুক্তি সম্পাদন; (২) মুরাকাবা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যান সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা এবং মনে করা যে, তিনি মানবের কার্যকলাপ দেখিতেছেন ও মনোভাব জানিতেছেন; (৩) মুহাসাবা অর্থাৎ কৃতকার্য পর্যালোচনা; (৪) মু'আকাবা অর্থাৎ নফ্সকে শাস্তি দান; (৫) মুজাহাদা অর্থাৎ নফ্সের বিরুদ্ধাচরণ; (৬) মু'আতাবা অর্থাৎ নফ্সকে তিরস্কার করা।

মুশারাতা (নফ্সের সহিত চুক্তি সম্পাদন)– কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই প্রবৃত্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুনিয়ার ব্যবসায়ে অপরকে শরীক করিয়া তাহার হস্তে মূলধন অর্পণ করিলে এবং সেই ব্যবসায়ে লাভ পাওয়া গেলে শরীককে হিতৈষী বন্ধু বলা চলে। কিন্তু মূলধনই নষ্ট করিয়া ফেলিলে সে দুশমন বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই শরীকের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করিবার পূর্বেই চুক্তি করিয়া লইতে হয়, চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী সে কাজ-কারবার পরিচালনা করে কিনা, তৎপ্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ অতি কড়াকড়িভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে নফ্সকে শরীক করিয়া লইয়াও তদ্রূপ নীতি অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, পরকারের বাণিজ্যের লাভ চিরস্থায়ী। কিন্তু সাংসারিক ব্যবসারের লাভ ক্ষণস্থায়ী। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ক্ষণস্থায়ী বস্তু

নিতান্ত তুচ্ছ। এমন কি জ্ঞানীগণ বলেন–"যে-বস্তু তত ভাল নহে অথচ চিরস্থায়ী, ইহা ক্ষণস্থায়ী উৎকৃষ্ট বস্তু হইতে উত্তম।"

পরমায়ু পারলৌকিক বাণিজ্যের একমাত্র মূলধন–জীবনের প্রতি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্নসদৃশ। এক একটি নিশ্বাসের বিনিময়ে পরকালের এক একটি অবিনশ্বর সম্পদ-ভাণ্ডার অর্জন করা চলে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এইরূপ অমূল্য রত্নের সদ্ব্যবহারে কতদূর যত্ন-সাধনা এবং হিসাব-নিকাশ আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ফজরের নামাযান্তে কিছু সময়ের জন্য মনোনিবেশ করত পরমায়ুর সদ্ব্যবহারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া লয়, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রত্যুষে কার্য আরম্ভের পূর্বেই স্বীয় নফসকে লক্ষ্য করিয়া বলে–"দেখ মন, পরমায়ু ব্যতিত তোমার কোন মূলধন নাই। যে-মুহূর্ত অতিবাহিত হইল তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। কেননা মৃত্যু পর্যন্ত তুমি যতগুলি নিশ্বাস ফেলিবে, তাহা আল্লাহ্‌র নিকট গণনা করা ও নির্দিষ্ট আছে; তদপেক্ষা অধিক একটি নিশ্বাসও ফেলিবার অবসর তোমাকে দেওয়া হইবে না। পরমায়ু শেষ হইয়া গেলে বাণিজ্য করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাহা করিবার এখনই করিয়া লও। পরমায়ু অতিসংকীর্ণ; পরকালে অনন্ত দীর্ঘ সময় পাইবে বটে, কিন্তু সেখানে কিছুই করিবার নাই। গত রজনীতে যখন ঘুমাইয়াছিলে তখন ত এক প্রকার মরিয়া ছিলে। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তোমাকে যেন নূতন জীবন দান করিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মরিয়া গেলে আশা থাকিয়া যাইত–'হায়! যদি একদিনের অবকাশ পাইতাম, তবে নিজের কাজ কিছুটা সংশোধন করিয়া লইতাম।' এখন আল্লাহ্ দয়া করিয়া তোমাকে এ-দিনটি দিলেন। হে নফ্‌স, কথা শুন--অদ্যকার প্রতিটি নিশ্বাসকে এক একটি অমুল্য রত্ন জ্ঞানে সদ্ব্যবহার কর এবং একটি মুহূর্তও বৃথা অপচয় করিও না। আগামীকল্য বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ হয়ত তুমি পাইবে না; তাহা হইলে তোমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। আজ বুঝিয়া লও যে, তুমি মরিয়া গিয়া এক দিনের জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিলে এবং আল্লাহ্ তোমাকে ইহা দান করিলেন। এমতাবস্থায় এই দিনটি হেলায় নষ্ট করত পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির আর কি হইতে পারে?"

হাদীস শরীফে আছে–ইহকালের দিবারাত্রের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘণ্টার বিনিময়ে কিয়ামত-দিবস মানবের সম্মুখে এক একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। প্রতিটি ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া মানবকে দেখানো হইবে। যে-সময়ে

সৎকার্য করা হইয়াছিল, সেই ঘণ্টার বিনিময়ে যে-ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে, তাহা পুণ্যের কারণে নূরে ভরপুর দেখা যাইবে। ইহা দর্শনে মানব মনে এত আনন্দ ও সুখ উথলিয়া উঠবে যে, ইহার কিয়দংশ দোযখবাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে তাহারা দোযখের অগ্নির কথা ভুলিয়া যাইবে। সেই আনন্দের কারণ এই, সেই ব্যক্তি জানিবে যে, ঐ নূর তাহার পক্ষে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় হইবে। তৎপর অপর একটি ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে। ইহা ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহা হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইবে যে, সকলেই নাক বন্ধ করিয়া ফেলিবে। যে-ঘন্টায় পাপ করা হইয়াছিল সেই ঘন্টার পরিবর্তে ইহা পাওয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তির মনে এমন ভয় ও লজ্জার উদ্ভব হইবে যে ইহা বেহেশ্‌তীগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে বেহেশ্‌ত তাহার নিকট দুঃখপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। অতঃপর অন্য একটি ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে; ইহা একেবারে শূন্য থাকিবে। ইহাতে আলো বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। যে-সময়ে বান্দা পাপ বা পুণ্য কিছুই করে নাই, সেই সময়ের পরিবর্তে এই শূন্য ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে। বিরাট রাজত্ব ও অপরিসীম ধনসম্পদ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তাহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া উহা নষ্ট হইতে দিলে মানব-মনে যেরূপ দুঃখ ও পরিতাপের সঞ্চার লইয়া থাকে, এই শূন্য ভাণ্ডার দেখিয়া বান্দার মনে তদ্রূপ দুঃখ ও পরিতাপের উদ্রেক হইবে।

ফলকথা এই যে, পরমায়ুর প্রতিটি ঘণ্টা পরকালে তদ্রূপ মানবের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সুতরাং মনকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলা মানবের পক্ষে উচিত–"হে নফস, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য চব্বিশটি ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে স্থাপন করিবেন। খবরদার! ইহার কোনটিই যেন শূন্য না থাকে; কারণ শূন্য থাকিলে যে অসীম মর্মবেদনা হইবে, ইহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না।" বুযুর্গগণ বলেন–"মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও পুণ্যবানগণ যে-পুরস্কার ও মরতবা লাভ করিবেন, তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত থাকিবে এবং তজ্জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।" এতএব স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমুহ নফ্‌সের নিকট অর্পণপূর্বক বলিয়া দেওয়া আবশ্যক–"হে মন, খরবদার! রসনা সংযত রাখিবে এবং চক্ষুকে নিষিদ্ধ দর্শন হইতে রক্ষা করিবে।" এইরূপে সপ্ত অঙ্গকে কুকর্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাকীদ করিবে। কেননা দোযখের যে সাতটি দ্বার আছে বলিয়া উক্ত আছে, তাহা তোমার সপ্ত কর্মেন্দ্রিয়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পাপের জন্যই তোমাকে

দোযখে যাইতে হইবে। অতএব তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কি প্রকার পাপ হইতে পারে বুঝিয়া লইয়া তৎসমুদয় হইতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিবে। তৎসঙ্গে সেই দিন যে-পরিমাণ যিকির-শোগল হইতে পারে ইহার প্রতি স্বীয় প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং যে-সমস্ত কাজ করা যাইতে পারে তাহা করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করত প্রবৃত্তিকে ধমক দিয়া বলিবে–"হে নফ্স, আমার কথার বিরুদ্ধাচারণ করিলে তোমাকে শাস্তি দিব এবং দুঃখকষ্টে নিপতিত করিব।" এইরূপ ধমক দেওয়ার কারণ এই যে, নফ্স অবাধ্য হইলেও উপদেশ এবং সাধনার প্রভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে নফ্সের সহিত তদ্রূপ চুক্তি গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ –

অর্থাৎ "আর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের মনের কথা জানেন; সুতরাং তাঁহাকে ভয় করিতে থাক।" (সূরা বাকারাহ্ ৩০ রুকূ, ২ পারা।) রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি নিজের হিসাব-নিকাশ করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্য করে, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে-কার্য সম্মুখে আসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ; হিতকর হইলে কর, অনিষ্টকর হইলে দূরে সরিয়া থাক।"

যাহাই হউক, প্রত্যহ সকালে মনকে সৎকর্মের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা আবশ্যক। এমন কি যে-সকল পরহেযগার লোক ধর্মপথে অটল হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখেও প্রতিদিন এইরূপ কার্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাঁহাদের পক্ষেও নফ্সের নিকট হইতে সেই কার্যের অঙ্গীকার লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মুরাকাবা– 'মুরাকাবা' শব্দের অর্থ হইল রক্ষণাবেক্ষণ করা ও পাহারা দেওয়া। সাংসারিক বাণিজ্যের শরীক হইতে লাভের অঙ্গীকার লইয়া তাহার নিকট মূলধন অর্পণ করিলেও যেমন তাহার কার্যকলাপ পরীক্ষা করা এবং তাহার আচরণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তদ্রূপ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা ও যাহাতে অপকর্ম করিতে না পারে তজ্জন্য পাহারা দেওয়া মানবের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এ-ব্যাপারে শৈথিল্য করিলে অলসতা অথবা বিলাসিতার কারণে প্রবৃত্তি স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতি গ্রহণ করে এবং অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে।

প্রকৃত মুরাকাবা–'আল্লাহ্ আমার সমস্ত কার্যকলাপ দেখিতেছেন এবং মনোভাব জানিতেছেন। মানুষে শুধু লোকের বাহ্য আচরণ দেখিতে পায়, আল্লাহ্ ভিতর-বাহিরের সমস্ত বিষয় সমভাবে দেখিতেছেন। –এই বিশ্বাসটি দৃঢ় করিয়া লওয়ার নামই প্রকৃত মুরাকাবা। 'আল্লাহ্ সব দেখিতেছেন, জানিতেছেন' কথাটি যে-ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিয়াছেন এবং এই উপলব্ধি যাঁহার হৃদযে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার দেহ ও মন সর্বদা ভীত ও বিনীত থাকে। এ বিশ্বাসটি যাহার নাই সে কাফির। আবার সেই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধাচরণে পাপে লিপ্ত হয়, সে নিতান্ত দুঃসাহসিক ও অবাধ্য। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى – অর্থাৎ "সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দেখিতেছেন?" (সূরা আ'লাক, ৩০ পারা।) এক হাব্শী রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি বহু পাপ করিয়াছি; আমার তওবা কবূল হইবে কি না?" হযরত (সা) বলিলেন "কবূল হইবে।" সেই ব্যক্তি আবার নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি যখন পাপ করিতেছিলাম তখন কি আল্লাহ্ দেখিতেছিলেন?" হযরত (সা) বলিলেন– "হাঁ, দেখিতেছিলেন।" ইহা শ্রবণমাত্র সেই ব্যক্তি এক দীর্ঘবিশ্বাস ফেলিলেন এবং বিকট চিৎকার করত ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তুমি যেন আল্লাহ্কে দেখিতে পাইতেছ, এইভাবে তাঁহার ইবাদত কর। যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।"

মোটের উপর কথা এই যে–আল্লাহ্ সর্বদা তোমার সহিত আছেন, সব জানিতেছেন দেখিতেছেন–এই কথাটি যে-পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত তোমার কোন কাজই ঠিক হইবে না; যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا – অর্থাৎ "আল্লাহ্ সব সময় তোমাদের সবকিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন।" (সূরা নিসা,) ১ রুকূ, ৪ পারা।) আল্লাহ্ আমাকে দেখিতেছেন' বিশ্বাসটি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকিলে ইহার চরম উন্নত অবস্থা এই হইবে যে তখন আল্লাহ্র তাজাল্লী সর্বদা মানবের নয়নগোচর হইতে থাকিবে।

কাহিনী– এক পীর সাহেবের বহু মুরীদ ছিল। তন্মধ্যে একজনকে তিনি

সর্বাধিক ভালবাসিতেন। ইহাতে অন্যান্য মুরীদ দুঃখিত ও লজ্জিত ছিল। পীর সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক মুরীদকে এক একটি পাখি দিয়া বলিলেন–"যেখানে কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান হইতে পাখি যবেহ করিয়া আনয়ন কর।" সকলেই নির্জন স্থানে যাইয়া পাখি যবেহ করিয়া আনিল। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রিয় মুরীদ পাখি যবেহ না করিয়া জীবিত অবস্থায় পীরের সম্মুখে উপস্থিত করত বলিল–"কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কারণ, আল্লাহ্ সর্বত্র দেখিতেছেন।" তখন পীর সাহেব অন্যান্য মুরীদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন–"এই উক্তি হইতে তাহার মরতবা তোমরা বুঝিয়া লও। এই ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র দর্শনে নিমগ্ন আছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করে না।" যখন বিবি যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে নির্জনে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন সর্বাগ্রে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবমূর্তির চক্ষু বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম বলিলেন–"হে যুলায়খা, তুমি প্রস্তর দেখিয়া লজ্জা করিতেছ; আকাশ-পাতালের সৃষ্টিকর্তা সর্বদর্শী আল্লাহ্কে কিরূপে আমি লজ্জা না করিয়া থাকিতে পারি?"

এক ব্যক্তি হযরত জুনায়দের (র) নিকট নিবেদন করিলেন–"আমি নিষিদ্ধ দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে রক্ষা করিয়া রাখিতে পারি না। কিরূপে রক্ষা করিব?" হযরত জুনায়দ (র) বলিলেন–"তুমি যেমন অপরকে দেখ, তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন, এই কথাটি অটলভাবে বিশ্বাস করিয়া লও।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন–"যাহারা পাপ কার্যের অভিলাষ করিয়া আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণে লজ্জিত হয় ও সেই পাপ হইতে বিরত থাকে, তাহাদের জন্য 'আদন' নামক বেহেশ্ত অবধারিত আছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"আমি হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত মক্কা শরীফে যাইতেছিলাম। আমরা উভয়ে এক স্থানে অবতরণ করিলাম। এমন সময় জনৈক রাখালের গোলাম পাহাড়ের উপর হইতে কতকগুলি ছাগল নামাইয়া লইয়া আসিল। হযরত ওমর (রা) বলিলেন–'একটি ছাগল আমার নিকট বিক্রয় কর। গোলাম নিবেদন করিল–'আমি গোলাম; এই ছাগলগুলির মালিক আমি নহি।' হযরত ওমর (রা) তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন–'মালিককে বলিও যে, একটি ছাগল বাঘে লইয়া গিয়াছে। সে কিরূপে জানিতে পারিবে (যে, তুমি বিক্রয় করিয়াছ)?' গোলাম নিবেদন করিল–তিনি জানিতে না পারিলেও আল্লাহ্ ত জানিতেছেন।" ইহা শুনিয়া

হযরত ওমর (রা) অপ্রকৃতিস্থ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি গোলামের প্রভুকে আহ্বান করিয়া আনিয়া উক্ত গোলামকে খরিদ করত আযাদ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন–'হে গোলাম, ঐ কথা বলিয়া তুমি পৃথিবীতে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলে এবং পরকালেও মুক্তি পাইবে।'

মুরাকাবার শ্রেণী-বিভাগ–মুরাকাবা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী–ইহা একমাত্র সিদ্দীকগণের পক্ষেই সম্ভবপর। সিদ্দীকগণের হৃদয় সর্বদা আল্লাহ্র অপ্রতিহত প্রতাপে নিমজ্জিত এবং তাঁহার ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ থাকে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য দিকে লক্ষ্য করিবার কোন অবকাশই তাঁহারা পান না। এই মুরাকাবা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ, তাঁহাদের মন প্রশান্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছে; বিধিসঙ্গত নির্দোষ বিষয় হইতেও তাঁহারা বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় পাপকর্মে কিরূপে তাঁহারা লিপ্ত হইবেন? এই শ্রেণীর মুরাকাবাকারিগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার উপায় ও কৌশল অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধেই রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"প্রত্যুষে যে-ব্যক্তি (আল্লাহ্র দিকে) একাগ্র মন রাখিয়া জাগ্রত হয়, আল্লাহ্ উভয় জগতে তাহার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া দেন।" এই শ্রেণীর কোন কোন লোক আল্লাহ্র ধ্যানে এত অধিক নিমগ্ন থাকেন যে, তাঁহাদের নিকট কথা বলিলে তাঁহারা শুনেন না এবং তাঁহাদের উন্মিলিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কেহ গমনাগমন করিলেও তাঁহারা দেখিতে পান না।

হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্নে যায়িদকে (র) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে চিনেন যিনি লোকের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া কেবল নিজের ভাবে তন্ময় রহিয়াছেন?" তিনি বলিলেন–"হাঁ এক ব্যক্তিকে চিনি। তিনি এখনই আসিতেছেন। ইতোমধ্যে হযরত ওতবাতুল গোলাম (র) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল–"আপনি পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন– "কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" অথচ তিনি লোকে লোকারণ্য রাজপথ দিয়া আগমন করিয়াছেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলায়হিস সালাম একদা একজন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে প্রাচীর ভ্রমে তদুপরি হস্ত রাখিয়া ভর করিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি এমন কাজ করিলেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমি ইহাকে দেওয়াল মনে করিয়া ছিলাম।" এক বুযুর্গ

বলেন–"আমি একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম; তাহারা তীরধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল। বহু দূরে একজন লোককে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার বাসনায় নিকটে গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন–'লোকের সহিত আলাপ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র যিকির উৎকৃষ্ট।' আমি বলিলাম–'আপনি তো নিঃসঙ্গ বসিয়া রহিয়াছেন।' তিনি বলিলেন–'না, আল্লাহ্‌ ও দুই ফিরিশ্‌তা আমার সঙ্গে আছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–'এই কওমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?' তিনি বলিলেন–'যাহাকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম–'পথ কোন্‌ দিকে?' তিনি আকাশের দিকে মুখ করত উঠিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বলিয়া গেলেন–'হে আল্লাহ, তোমা হইতে দূরে রাখিবার বহু লোক আছে।" হযরত শিবলী (র) একদা হযরত সাওরীর (র) নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি মুরাকাবায় এমন তন্ময় ও নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন যে, তাঁহার শরীরের একটি লোম পর্যন্ত নড়িতেছে না। হযরত শিবলী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কাহার নিকট হইতে এমন নিস্পন্দভাবে মুরাকাবা করিতে শিখিলেন?" তিনি বলিলেন–"বিড়াল হইতে শিখিয়াছি। কারণ, ইঁদুরের প্রতীক্ষায় বিড়ালকে ইঁদুরের গর্তের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে খফীফ (র) বলেন "আমি লোকমুখে শুনিলাম, সূর নামক স্থানে এক বৃদ্ধ ও এক যুবক সর্বদা মুরাকাবায় বসিয়া থাকেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে কেবলামুখী হইয়া উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি একাদিক্রমে তিনবার সালাম দিলাম; কিন্তু তাঁহারা জওয়াব দিলেন না। আমি তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া সালামের জওয়াব দিতে অনুরোধ করিলাম। তখন যুবক মাথা তুলিয়া বলিলেন–'হে খফীফের পুত্র, পরমায়ু নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; আর ইহার সামান্য অংশই বাকী আছে। বাকী অংশটুকুর বিরাট অংশ আবার তুমি অনর্থক কাড়িয়া লইলে! হে খফীফ তনয়, তুমি অত্যন্ত গাফিল; তুমি আমাদিগকে কর্তব্যকার্যে বাধা দিয়া সালামের উত্তর দিতে বাধ্য করিলে।' এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করত নিস্তব্ধ হইলেন। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেলাম এবং আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পাইল, আমি তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহাদের সহিত যুহর আসরের নামায পড়িলাম এবং তৎপর নিবেদন করিলাম–'আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।' যুবক বলিলেন–"হে খফীকের

পুত্র, আমরা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত, উপদেশ দিবার ভাষা আমাদের নাই।' আমি তিন দিবারাত্র তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহারাও কোন কথা বলেন নাই, এবং আমিও কোন কথা বলি নাই; আর কেহই নিদ্রাও যাই নাই। অনন্তর আমি মনে মনে বলিলাম, –'তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া উপদেশ দিতে অনুরোধ করিব।' তখন সেই যুবক আবার মাথা তুলিয়া বলিলেন–'এমন লোকের অনুসন্ধান কর যাহাকে দেখিলেই তোমার মনে আপনিআপনি আল্লাহর স্মরণ জাগিয়া উঠে এবং আল্লাহ্‌র ভয় তোমার অন্তরে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ব্যক্তি তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি নিঃসৃত প্রভাবেই (যবানে হালে) তোমাকে উপদেশ দিবেন; কথা বলিয়া উপদেশ দিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।"

ফলকথা, সিদ্দীকগণের মুরাকাবা এইরূপই হইয়া থাকে। তাঁহারা আল্লাহ্‌তে একেবারে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর মুরাকাবা পরহেযগার ও পুণ্যবান লোকদের কার্য। এই প্রকার লোক ভালরূপে অবগত আছেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁহাদের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে দেখিতেছেন এবং এই বিশ্বাসে তাঁহারা আল্লাহকে শরমাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকেন না; বরং নিজের ও জগতের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ থাকেন। এই শ্রেণীর লোককে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা চলে, যে নির্জনে একাকী কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা উলঙ্গ আছে, এমতাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বালককে দেখিয়া লজ্জায় সেই ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতায় নিজে নিজকে আবৃত করিয়া লইল। অপর পক্ষে পূর্বোক্ত সিদ্দীক লোকের দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, মনে কর, কাহারও সম্মুখে অকস্মাৎ মহাপ্রতাপশালী বাদ্‌শাহ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার ভয়ে আত্মহারা ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

মুরাকাবার দ্বিবিধ ধারা–যাহাই হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুরাকাবাকারিগণের পক্ষে স্বীয় অবস্থা, কল্পনা এবং গতি-স্থিতি গভীরভাবে মনোনিবেশপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করিলে দ্বিবিধ ধারা অবলম্বনে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মুরাকাবার প্রথম ধারা–কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহা করা আবশ্যক। কার্যের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র ইহা ভাল কি মন্দ, পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্তব্য।

এমন কি যে-কোন খেয়ালই হৃদয়ে উদিত হউক না কেন, তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখা উচিত। পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে,ইহা আল্লাহ্‌র জন্য হইতেছে তবে কার্য আরম্ভ করিবে। কিন্তু প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা চরিতার্থের জন্য হইলে উহা করিবে না এবং আল্লাহকে লজ্জা করিবে। বরং এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছে বলিয়া নিজকে তিরস্কার করিবে এবং কোন প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে কর্মের ইচ্ছা জন্মিলে পরিণামে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণটি অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লইবে। কর্মের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র এই শ্রেণীর মুরাকাবা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, মানুষের নিজ ক্ষমতায় সম্পন্ন প্রতিটি গতি-স্থিতি সম্পর্কে তাহাকে তিনটি প্রশ্ন করা হইবে; যথা–(১) কেন করিলে? (২) কিরূপে করিলে? (৩) কাহার জন্য করিলে?

প্রথম প্রশ্নের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, সেই উদ্দেশ্যে না করিয়া কেন শয়তানের অনুসরণে ও প্রবৃত্তিবিশেষকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য করিলে? ইহার উত্তর সন্তোষজনকরূপে দিতে পারিলে এবং কার্যটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকিলে তৎপর প্রশ্ন করা হইবে, তুমি কাজটি কিরূপে করিলে? অর্থাৎ প্রতিটি সৎকার্য করিবার জন্য ইহার শর্ত, নিয়মপদ্ধতি ও তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই কার্যটি কি তুমি জ্ঞান অনুসারে ও যথোচিত নিয়ম অনুযায়ী করিয়াছ? না, জ্ঞানান্ধভাবে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া করিয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তরও সন্তোষজনকভাবে দিতে পারিলে এবং কার্যটি যথোচিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী করা হইয়া থাকিলে পরিশেষে জিজ্ঞাসা করা হইবে–এই কার্য কাহার জন্য করিলে? প্রত্যেক কাজ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সংকল্পে করা তোমার প্রতি ওয়াজিব ছিল। তুমি কি ইহা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করিয়াছ? তাহা হইলে ইহার যথোপযুক্ত পুরস্কার পাইবে। কিন্তু যদি ইখলাসের সহিত না করিয়া নিজের সাধুতা প্রদর্শনপূর্বক লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও সম্মান লাভের বাসনায় এই কাজ করিয়া থাক তবে ইহার পুরস্কার লোকের নিকট হইতে চাহিয়া লও। আর যদি দুনিয়া অর্জনের বাসনায় করিয়া থাক তবে উহার সওয়াব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে কার্যটি অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তিতে নিপতিত হইবে। কারণ, আল্লাহ তোমাকে পূর্বে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ –

অর্থাৎ "সাবধান, একমাত্র আল্লাহত্ম জন্যই খাঁটি ইবাদত।" (সূরা যুমর, ১ রুকূ, ২৩ পারা।) তিনি আরও জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ –

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিতেছ নিশ্চয়ই তাহারা তোমাদেরই ন্যায় দুর্বল দাসমাত্র।" (সূরা আ'রাফ ২৪ রুকূ, ৯ পারা।)

যে-ব্যক্তি এই বিষয়টি ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছে, বুদ্ধিমান হইলে সেই ব্যক্তি কার্যের উদ্দেশ্য পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, মনে কোন খেয়াল প্রথম উদয় হইলে ইহার পরীক্ষায় মনোনিবেশ করা আবশ্যক। খেয়ালকে সংযত করিতে না পারিলে তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে, তৎপর ইহার প্রতি উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইবে এবং অবিলম্বে ইহার প্রবল ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিবে ও অবশেষে তদনুযায়ী অঙ্গপ্রতঙ্গের সঞ্চালনে কার্য সম্পন্ন হইবে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন –"যখন তোমার মনে কোন কার্যের খেয়াল জন্মে তখন আল্লাহ্‌কে ভয় কর।"

মনের গতি নির্ধারণে অক্ষম হইলে খাঁটি আলিমের সংসর্গের আবশ্যকতা– মনের গতি পরীক্ষা করিয়া ভাল-মন্দ বুঝিয়া লওয়া একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং এই জ্ঞান বড় দুর্লভ। মনের কোন্ গতিটি আল্লাহ্‌র জন্য এবং কোন্‌টি প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সংঘটিত তাহা নির্ধারণে যে-ব্যক্তি অক্ষম তাহার পক্ষে আলিম বা-আমলের সংসর্গের আবশ্যক। এমন আলিমের সংসর্গ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ের নূর নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। দুনিয়াদার আলিমের সংসর্গ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। কারণ, দুনিয়াদার আলিম শয়তানের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"হে দাঊদ, সংসারাসক্তি যে-আলিমকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। সংসারাসক্ত আলিম তোমাকে আমার প্রেম হইতে বঞ্চিত করিবে। কারণ, এমন আলিম আমার বান্দাদের পক্ষে দস্যুস্বরূপ।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও দূরদর্শী এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে যাহার বুদ্ধি পূর্ণ থাকে, তাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।" দুইটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মানব চরম উন্নতি লাভের উপযুক্ত হয়; যথা–(১) প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা দর্শন করিয়া ভালমন্দ নির্বাচন করিবার

বিচক্ষণতা এবং (২) জ্ঞানের প্রভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবার ক্ষমতা। এই দুইটি শক্তির মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক আছে। কারণ, প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমনের উপযোগী জ্ঞান যাহার নাই, ভালমন্দ নির্বাচনের বিচক্ষণতাও তাহার থাকে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপ করে তাহার জ্ঞান তাহা হইতে এমনভাবে দূরে সরিয়া যায় যে, আর এখনও ফিরিয়া আসে না।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"কর্ম তিন প্রকার (১) সুস্পষ্ট সৎকর্ম–ইহা তোমাদের করা উচিত; (২) সুস্পষ্ট মন্দ কার্য– ইহার ত্রিসীমায়ও যাইবে না, (৩) কার্যটি ভাল কি মন্দ বলিয়া স্পষ্টরূপে জানা যায় না, এইরূপ কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিবে।"

মুরাকাবার দ্বিতীয় ধারা–কার্য যথারীতি ও যথানিয়মে সম্পন্ন হইতেছে কি না, পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা। কার্যানুষ্ঠানকালে ইহার আবশ্যক। সমস্ত কার্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা–(১) ইবাদত, (২) পাপ কার্য ও (৩) মুবাহ্ বা এমন নির্দোষ কার্য যাহাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই। ইবাদত কার্যের মুরাকাবার ধারা এই যে, উহা বিশুদ্ধ সংকল্পে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য করা যাইতেছে কি না এবং তৎসময়ে আল্লাহ্‌র দিকে গাঢ় মনোযোগ আছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উহা যথানিয়মে সম্পন্ন হইতেছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে এবং অতিরিক্ত সওয়াব লাভের জন্য কার্যটি যথাসম্ভব সুন্দর ও নির্দোষভাবে করিতে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করা উচিত নহে। পাপ কার্যের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে যেরূপ লজ্জা করা আবশ্যক, যেরূপ অনুতাপের সহিত তওবা করা উচিত এবং যেমন কাফ্‌ফারা আদায় করা দরকার, তৎসমুদয় যথারীতি পালন করা হইতেছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা পাপ কার্যে মুরাকাবা। মুবাহ্ কার্যে মুরাকাবার নিয়ম এই–এই প্রকার কার্যে যেরূপ আদব ও নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, ইহা পালন করা এবং নি'আমত পাইয়া নি'আমত দাতার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সর্বদা আল্লাহ্ দেখিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করা। যেমন, বসিলে আদবের সহিত বসা, শয়নকালে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া ডান পার্শ্বে শয়ন করা। তদ্রূপ আহারের সময় আল্লাহ্‌র করুণা ও কৌশলের চিন্তা ব্যতীত গাফিলভাবে আহার করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। প্রতিটি আহার্য বস্তুর আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও গঠনে সৃষ্টিকর্তার কিরূপ বিস্ময়কর শিল্প-কৌশল রহিয়াছে! মানবের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আল্লাহ্‌র

তা'আলার কি আশ্চর্য আশ্চর্য সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ পাইতেছে! মানবের যে-সকল অঙ্গ অন্ন গ্রহণ করে, যথা-অঙ্গুলী, মুখ, দন্ত, গলনালী, উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি এবং যে সমস্ত অঙ্গ ভুক্তদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিয়া হজম করার ও যেগুলি ক্ষুধা নিবারণের উপায় করিয়া দেয়, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্য শিল্পের নির্দশন। এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টির-কৌশল অবলম্বনে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এইরূপ চিন্তা করা আলিমগণের কার্য।

আবার কোন কোন আলিম এমন আছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর এমন কি সামান্য খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্গত শিল্প-কৌশল যতই গভীর মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ততই তাঁহাদের অন্তর পরম শিল্পী আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও জ্ঞান-গরিমার দিকে উন্নীত ও অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে তাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রতাপ, গুণ ও সৌন্দর্যে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। তাওহীদভাবে তন্ময় ব্যক্তি ও সিদ্দীকগণই এরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আহার গ্রহণ করাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে অসন্তোষজনক ও বিরক্তিকর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করত বলেন–"হায়, আহারের যদি প্রয়োজনই না হইত!' আহারের প্রয়োজন কেন হয়, এই সম্বন্ধেও তাঁহারা চিন্তা করেন। সংসার-বিরাগিগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। অন্য একদল লোক আছে নিতান্ত লোভী। তাহারা আহারে অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকে এবং কি প্রকারে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয় এবং অধিক পরিমাণে উদরস্থ করা যায়, এই চিন্তায় সর্বদা নিমজ্জিত থাকে। এই শ্রেণীর লোকে পক্ক খাদ্যদ্রব্যের দোষ ও পাচকের ত্রুটি ধরে, এমন কি স্বভাবজাত ফলমূলেরও নিন্দা করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না যে, সকল পদার্থ আল্লাহ্‌র অনন্ত শিল্প চাতুর্যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং শিল্পদ্রব্যের দোষ ধরিলে শিল্পীর নিন্দা করা হয়। সংসারমুগ্ধ গাফিল লোকদের এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সর্বপ্রকার মুবাহ্ বস্তু ভোগের সময়েই মুরাকাবার প্রভেদ অনুযায়ী লোকের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

মুহাসাবা (কৃতকর্ম-পর্যালোচনা)– কার্যশেষে মুহাসাবা অর্থাৎ কৃতকর্ম পর্যালোচনা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যহ দৈনিক কাজ সম্পন্ন করিয়া রাত্রিতে শয়নকালে একবার প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া উচিত। তাহা হইলে লাভ-ক্ষতির একটা আন্দায পাওয়া যাইবে। শরীয়তে যে-সকল কাজ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া

নির্ধারিত হইয়াছে, উহা যথাযথ পালন করিলে মূলধন ঠিক থাকে। উহা সম্পন্ন করার পর অতিরিক্ত সৎকার্য করিলে এইগুলি লাভে পরিগণিত হয়। সাংসারিক ক্ষতির আশঙ্কায় লোকে যেমন অংশী হইতে কড়াকড়িভাবে হিসাব-নিকাশ লইয়া থাকে তদ্রূপ স্বীয় প্রবৃত্তি হইতেও হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, প্রবৃত্তি নিতান্ত বাকপটু ও প্রতারক। প্রবৃত্তি নিজের হীন স্বার্থকে তোমার সম্মুখে ইবাদতরূপে উপস্থাপিত করে যাহাতে তুমি ইহাকে লাভজনক মনে কর; অথচ ইহা তোমার জন্য নিতান্ত অনিষ্টকর। এমন কি নির্দোষ মুবাহ কার্যেও প্রবৃত্তির নিকট হইতে হিসাব লইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, কেন এ-কাজ করিলে? কাহার জন্য করিলে? প্রবৃত্তির কোন দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাইলে তজ্জন্য ইহাকে দায়ী করিবে এবং ইহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিবে।

হযরত ইব্নে সাম্মাহ্ (র) নামক এক বুযুর্গ হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বয়স ষাইট বৎসর হইয়াছে। তিনি আরও হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এই ষাইট বৎসরে একুশ হাজার ছয় শত দিন হয়। তৎপর তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন–"হায় আফসোস! প্রত্যহ এক একটি পাপ করিলেও একুশ হাজার ছয় শত পাপ হইয়াছে। হায়! এমতাবস্থায় পরিত্রাণ কিরূপে হইবে? বিশেষত এমন কোন দিনও যদি গত হইয়া থাকে যে-দিন হাজার পাপ সংঘটিত হইয়াছে; তবে কি অবস্থা হইবে!" এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বিকট চিৎকারপূর্বক তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। লোকে দেখিল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির আচরণ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। তাহারা নিজের হিসাব লইতেছে না। অথচ তাহারা যে পাপ করিতেছে, ইহার প্রত্যেকটির জন্য যদি এক একটি কঙ্কর কোন গৃহে নিক্ষেপ করা যায় তবে সেই গৃহ কঙ্করে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আবার 'কিরামান কাতিবীন' ফিরিশতা যদি পাপ লিখিবার জন্য মজুরি চাহিতেন তবে তাহাদের সমস্ত ধন নিঃশেষ হইয়া যাইত। মানুষের অবস্থা তো এই যে, কয়েকবার 'সুব্হানাল্লাহ' জপিলে ইহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য হাতে তসবীহ রাখে এবং এক ফেরা পড়া হইলে বলে–আমি একশত বার পড়িলাম। কিন্তু দিবারাত্র লোক যে সকল বেহুদা কথা বলিয়া থাকে ইহার কোন হিসাবই লয় না। ইহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য হাতে কোন কিছু রাখেও না। বেহুদা কথার হিসাব রাখিলে দেখা যাইত যে, প্রত্যহ সহস্রাধিক বেহুদা কথা বলা হইয়া থাকে। ইহা সত্ত্বেও নেকীর পাল্লা ভারী হইবে

বলিয়া আশা করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। এইজন্যই হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"তোমার কার্য ওযন হইবার পূর্বে তুমি নিজেই উহা ওযন করিয়া লও।" তিনি যখন রাত্রিকালে গৃহে ফিরিতেন তখন স্বীয় পদে দুররা মারিতেন এবং বলিতেন–"তুই অদ্য কি করিয়াছিস?" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন যে, মৃত্যুকালে হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন –"ওমর (রা) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার বন্ধু নাই।" তৎক্ষণাৎ তিনি আবার বলিলেন–"হে আয়েশা, আমি কি বলিলাম?" হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন–"আপনি বলিয়াছেন, ওমর অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার বন্ধু নাই।" তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া বলিলেন–"তাহা নহে, ওমর অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেউ নাই।" দেখ হযরত আবূ বকর (রা) এতটুকু কথারও হিসাব লইয়া যখন বুঝিলেন যে, ইহা ঠিক হয় নাই তখনই তাঁহার উক্তি সংশোধন করিয়া লইলেন।

হযরত ইব্নে সালাম (র) একদা লাকড়ির বোঝা কাঁধে লইয়া যাইতেছিলেন। লোকে দেখিয়া বলিল–"বোঝা বহন করা গোলামের কাজ।" তিনি বলিলেন–"আমি মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, এই কাজ করিয়া ইহার অবস্থা কিরূপ হয়।" হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–'আমি একদিন দেওয়ালের আড়াল হইতে হযরত ওমরকে (রা) এক বাগানে দেখিয়াছিলাম। তিনি স্বীয় মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন–"সাবাস! লোকে তোমাকে আমীরুল মুমিনীন বলিয়া আহ্বান করে অথচ তুমি আল্লাহকে ভয় কর না। এই জন্য আল্লাহ্র শাস্তি ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত থাক!" হযরত হাসান (রা) বলেন–"যে মন নিজকে তিরস্কার করে এবং কার্য শেষে সর্বদা এইরূপ হিসাব লয় যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে, অমুক বস্তু কেন আহার করিলে?' এমন মনকেই 'নফসে লাওয়ামা' বলে।' ফলকথা এই যে, কৃতকর্মের হিসাব লওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক।

মু'আকাবা (প্রবৃত্তিকে শাস্তি দান)–প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ না করা অন্যায়। প্রবৃত্তিকে স্বাধীন ছাড়িয়া দিলে ইহা নির্ভয় ও অবাধ্য হইয়া পড়ে যখন ইহাকে বশে আনা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বরং অন্যায় কার্য করিবামাত্র ইহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। সন্দেহের বস্তু খাইয়া থকিলে শাস্তিস্বরূপ ইহাকে উপবাস রাখিতে হইবে; নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু বন্ধ করিয়া

লইতে হইবে। অন্যায় কার্য ধরা পড়িলে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করিবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপই করিতেন।

এক আবিদ ঘটনাক্রমে এক মহিলার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তিনি সেই হস্তখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইস্‌রাঈল বংশের এক দরবেশ বহুকাল গির্জার মধ্যে বাস করিতেন। এক রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মবিক্রয়ের অভিলাষ জ্ঞাপন করে, দরবেশ তাহার নিকটবর্তী হইবার জন্য গির্জা হইতে একটি পা বাহির করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত হইলে তিনি গির্জাতে প্রবেশ করিতে চাহিলেন এবং মনে মনে বলিলেন–" যে-পদ পাপপথে গির্জা হইতে বাহির হইয়াছে, ইহাকে পুনরায় ভিতরে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।" কাজেও তাহাই হইল। সেই পদখানা গির্জার বাহিরেই রহিল। বাহিরে থাকিয়া প্রচণ্ড শীত ও গরমে উহা শরীর হইতে খসিয়া পড়িল। হযরত জুনায়দ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌নুল কুযায়নী (র) বলেন–"প্রচণ্ড শীতকালের এক রজনীতে আমার স্বপ্নদোষ ঘটে। আমি তৎক্ষণাৎ গোসল করিতে চাহিলাম। কিন্তু শীতের ভয়ে আমার প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল–'এই শীতে গোসল করিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন? সকালে হাম্মামে গিয়া গরম পানিতে গোসল করিও।' আমি শপথ করিয়া বলিলাম–'এখনই সমস্ত পরিহিত বস্ত্র ভিজাইয়া গোসল করিব এবং সেইগুলি শরীরে রাখিয়াই শুকাইয়া লইব।' আমি ইহাই করিলাম।" হযরত জুনায়দ (র) এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ "যে-প্রবৃত্তি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে শৈথিল্য করে ইহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।" এক সংসারবিরাগী এক মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎপর ইহার শাস্তিস্বরূপ শপথ করিলেন যে, তিনি কখনও ঠাণ্ডা পানি পান করিবেন না। ইহার পর জীবনে কখনও তিনি ঠাণ্ডা পানি পান করেন নাই।

হযরত হাস্‌সান ইবনে আবূ সেনান (র) একদা এক বিলাস ভবনের নিকট দিয়া যাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন–"ইহা কে নির্মাণ করিয়াছে?" তৎক্ষণাৎ তিনি নিজে নিজে বলিলেন–"যে-পদার্থের তোমার কোন আবশ্যকতা নাই, সেই সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আল্লাহর শপথ, এক বৎসর রোযা রাখিয়া তোমাকে শাস্তি দিব।" তিনি তাহাই করিলেন। হযরত আবূ তালহা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একদা স্বীয় খোরমা বাগানে নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে একটি সুন্দর পাখি বাগানে উড়িতেছিল। সেই সৌন্দর্যের খেয়াল তাঁহার মনে

উদিত হইলে নামাযে অন্যমনস্ক ভাব প্রবেশ করে এবং কয় রাকাত নামায পড়া হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি সমস্ত বাগানটি দান করিয়া দিলেন। হযরত মালিক ইবনে যয়গাম (র) বলেন–"হযরত রিবাহুল কয়সী (র) একদা আগমন করত আসরের নামাযের পর আমার পিতাকে ডাকিলেন। আমি বলিলাম–'তিনি ঘুমাইতেছেন।' তিনি বলিলেন–'এখন কি ঘুমাইবার সময়?' তৎপর তিনি প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। শুনিতে পাইলাম তিনি যাইবার কালে স্বীয় প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন–'হে অপদার্থ, এখন নিদ্রার সময় কি না জিজ্ঞাসা করিবার তোর কি আবশ্যকতা আছে? আমি শপথ করিলাম তোর এই অনধিকার চর্চার জন্য তোকে এক বৎসর বালিশের উপর মাথা রাখিতে দিব না।' এই কথা বলিতে বলিতে এবং ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিতেছিলেন–'তুই কি আল্লাহ্‌কে ভয় করিস না?" হযরত তামীমে দারী (রা) একদা এমন নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন যে, তাঁহার তাহাজ্জুদের নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাতে তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, পূর্ণ এক বৎসর তিনি রাত্রে শয়ন করিবেন না।

হযরত আবূ তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি উত্তপ্ত বালুকা ও কঙ্করের উপর গড়াগড়ি করিতেছিলেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন–"হে রজনীর মরা ও দিবসের অলস, তোর অত্যাচার কত দিন সহ্য করিব?' রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"ওহে, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার প্রবৃত্তি আমার উপর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।" হযরত (সা) বলিলেন –'এখন আকাশের দ্বার তোমার জন্য খোলা হইয়াছে এবং তোমার কারণে ফিরিশতাগণের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলা গর্ব করিতেছেন।' তৎপর হযরত (সা) সাহাবাগণকে বলিলেন–"এই ব্যক্তি নিকট হইতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লও।" সাহাবাগণ প্রত্যেকে তাঁহার নিকট যাইয়া দু'আ চাহিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রত্যেকের জন্য দো'আ করিতেছিলেন। তৎপর হযরত (সা) সেই ব্যক্তিকে সমবেতভাবে সকলের জন্য দু'আ করিতে বলিলেন। সেই ব্যক্তি দু'আ করিতে লাগিলেন–"হে আল্লাহ্ পরহেযগারীকে তাঁহাদের পাথেয়স্বরূপ কর এবং সকলকেই সৎপথে রাখ।"

হযরত (সা) ইহা শুনিয়া দু'আ করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, তাহাকে থামাও অর্থাৎ যে-দু'আ উত্তম তাহাই তাহার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দাও।" তখন সেই ব্যক্তি এইরূপ দু'আ করিতে লাগিলেন–"ইয়া আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে বেহেশ্‌তে স্থান দাও।"

হযরত মজমা (র) নামক এক বুযুর্গ একদা এক ছাদের দিকে তাকাইলে এক মহিলার দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন–"এখন হইতে আর আকাশের দিকেই দৃষ্টিপাত করিব না।" হযরত আহ্‌নফ ইব্‌নে কায়স (র) দিবসের কাজ সমাপনান্তে রজনীতে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির হিসাব লইতে বসিতেন। তিনি বারবার প্রদীপ শিখার উপর স্বীয় অঙ্গুলী স্থাপনপূর্বক বলিতেন–"অমুক দিন তুই অমুক কাজ কেন করিলি? অমুক দ্রব্য কেন খাইলি?

মোটের উপর কথা এই যে, সতর্ক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তিকে হঠকারী জানিয়া সর্বদাই উক্ত প্রকারে শাস্তি দিতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, শাস্তি না দিলে প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং ধর্ম-জীবন বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা সর্বদা প্রবৃত্তিকে শাসনে রাখিতেন।

মুজাহাদা (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ–বুযুর্গগণ স্বীয় প্রবৃত্তিকে সৎকার্যে অলস দেখিলে ইবাদতের পরিমাণ বৃদ্ধি করত উহা সমাপনে বাধ্য করিয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিতেন। হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমার এই অবস্থা ছিল যে, এক ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়িতে না পারিলে এক রাত্রি তিনি নিদ্রা যাইতেন না। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়িতেন না পারায় ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের জমি দান করিয়া দিলেন। একদা হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মাগরিবের নামাযে এতটুকু বিলম্ব ঘটিল যে, এই সময়ে দুইটি তারকা আকাশে দেখা গিয়াছিল। ইহার ফাফ্‌ফারাস্বরূপ তিনি দুইজন গোলাম আযাদ করিয়া দিলেন। এই প্রকার বহু কাহিনী আছে।

ইবাদতে প্রবৃত্তির শিথিলতা দূর করিবার উপায় – প্রবৃত্তি ইবাদতে শৈথিল্য করিতে আরম্ভ করিলে সাধনায় রত কোন বুযুর্গের সংসর্গে অবস্থান করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুযুর্গের কঠোর সাধনা দর্শনে প্রবৃত্তির শৈথিল্য দূর হইবে

এবং তাহারও তদ্রূপ সাধনার প্রবল ইচ্ছা জন্মিবে। এক বুযুর্গ বলেন–"যখনই আমার মধ্যে ইবাদতের কঠোর সাধনার শৈথিল্য অনুভব করিতাম তখনই আমি হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিকে (র) দেখিতে যাইতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে ইবাদতের অনুরাগ এক সপ্তাহকাল সতেজ থাকিত।" তদ্রূপ বুযুর্গ পাওয়া না গেলে সেই প্রকার রিয়াযতকারী ব্যক্তিগণের জীবচরিত ও কার্যাবলীর কাহিনী পাঠ ও শ্রবণ করা আবশ্যক। এ-স্থলে কয়েকজন বুযুর্গের অবস্থা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

হযরত দাউদ তায়ী (র) রুটি খাইতেন না। দিবসে রোযা রাখিয়া রাত্রে আটা পানিতে মিশাইয়া পান করিতেন। তিনি বলিতেন–"রুটি না খাইয়া আটা পানিতে মিশাইয়া খাইলে যে-সময় বাঁচে সেই সময়ে কুরআন শরীফের পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যায়। আমি সেই মূল্যবান সময়টুকু বৃথা নষ্ট করিব কেন?" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনার গৃহের ছাদের কড়িকাঠ কবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?" তিনি বলিলেন–"আমি ত্রিশ বৎসর যাবত এই গৃহে বাস করিতেছি। কিন্তু কখনও ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই।" বৃথা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করাকে বুযুর্গগণ মক্‌রূহ বলিয়া মনে করেন।

হযরত আহমদ ইব্‌নে রযীন (র) ফজরের নামাযের পর হইতে আসর পর্যন্ত একই স্থানে বসিয়া থাকিতেন এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকে তাঁহাকে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন–"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে চক্ষু এইজন্য দান করিয়াছেন যে, তাহারা চতুষ্পার্শের পদার্থ দর্শন করিয়া আল্লাহ্‌র আশ্চর্য সৃষ্টি-কৌশল ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে; যে-ব্যক্তি এই সকল দর্শন করিবে, অথচ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, তাহার নামে এক একটি গোনাহ লিপিবদ্ধ হইবে।" হযরত আবূ দরদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"তিনটি কার্যের জন্য আমি জীবিত থাকাকে পছন্দ করি– (১) সুদীর্ঘ রাত্রি সিজদায় কর্তন করিব, (২) বড় বড় দিনগুলি পিপাসায় অতিবাহিত করিব (অর্থাৎ রোযা রাখিব) এবং (৩) যাঁহারা সর্ব বিষয়ে পবিত্র ও যাঁহাদের আপাদমস্তক হিক্‌মতে পরিপূর্ণ তাঁহাদের সংসর্গ লাভ করিব।" হযরত আলকাম ইব্‌নে কায়সকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি নিজকে এত কষ্টে রাখেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমি নিজকে ভালবাসি বলিয়া তাহাকে দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি।" তাহারা আবার বলিল–"শরীরকে

এরূপ কষ্ট দেওয়া আপনার উপর ওয়াজিব নহে।" তিনি বলিলেন–"আগামীকল্য কিয়ামত দিবস যেন এইজন্য অনুতাপ করিতে না হয় যে, দুনিয়াতে এই কার্যটি কেন করি নাই? তজ্জন্য এখন যতদূর সাধ্য প্রাণপণে কাজ করিয়া লইতেছি।" হযরত জুনায়দ (র) বলেন–"আমি হযরত সরী সকতীর (র) মধ্যে এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি যে, তাহা আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার বয়স আটান্ন বৎসর হইয়াছিল অথচ মৃত্যুর সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাঁহাকে কেহই শয্যা গ্রহণ করিতে দেখে নাই।

হযরত আবূ মুহাম্মদ হারীরী (র) একবার পূর্ণ এক বৎসর মক্কা শরীফে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন কথা বলেন নাই, ঘুমান নাই, কিংবা কোন বস্তুর উপর পৃষ্ঠ রাখিয়া হেলান দেন নাই বা পা বিস্তার করিয়া বসেন নাই। হযরত আবূ বকর কাত্তানী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি এত কঠোর রিয়াযত (প্রবৃত্তিনিগ্রহ) কিরূপে করিতে সমর্থ হইলেন?" তিনি বলিলেন–"আমার অন্তরের সত্যপরায়ণতার দরুন আমি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, ইহাই আমাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এরূপ রিয়াযত করিতে সামর্থ্য দিয়াছে।" এক বুযুর্গ বলেন–"আমি একদিন দেখিলাম হযরত ফতেহ্ মুসল্লী (র) রোদন করিতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তমিশ্রিত অশ্রু নির্গত হইতেছে। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"আমার পাপ স্মরণ করিয়া আমি বহু দিন পর্যন্ত চক্ষু হইতে অশ্রুজল বাহির করিয়াছি। কিন্তু এ রোদনে আন্তরিকতা ছিল না। এখন সেই ত্রুটি স্মরণে চক্ষু হইতে রক্তপাত করিতেছি।" তাঁহার ইন্তিকালের পর লোকে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"ঐ রোদনের ফলে আল্লাহ্ আমাকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিয়াছেন যে, গত চল্লিশ বৎসর ফিরিশ্‌তাগণ যে আমলনামা পৌঁছাইয়াছেন তন্মধ্যে আমার কোন পাপ ছিল না।" হযরত দাঊদ তায়ীকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি দাড়ি আঁচড়াইলে কি অন্যায় হইবে?" তিনি বলিলেন–"চিরুণী করিতে মনোবিবেশ করিলে আমি গাফিল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।"

হযরত উয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হু রাত্রিসমূহকে পৃথক পৃথক ইবাদতের জন্য ভাগ করিয়া লইতেন। যে রাত্রিকে তিনি রুকূর রাত্রি বলিতেন,

এক রুকূতেই তিনি সেই রাত্রি প্রভাত করিয়া দিতেন। যে রাত্রিকে সিজদার রাত্রি বলিতেন সেই রাত্রি এক সিজদায় অতিবাহিত করিতেন। হযরত ওত্‌বাতুল গোলাম (র) কঠোর রিয়াযত করিতেন। এইজন্য তিনি সুস্বাদু দ্রব্য পানাহার করিতেন না। একদা তাঁহার জননী সন্তান-স্নেহের বশবর্তী হইয়া বলিলেন–"বৎস, নিজের উপর একটু দয়া কর।" তিনি বলিলেন–"স্নেহময়ী জননী, আমি আল্লাহ্‌র দয়ার ভিখারী। দুনিয়ার এই সামান্য কয়েক দিন কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যেন অনন্তকালের আরাম পাই, এই চেষ্টা করতেছি।" হযরত রবী' রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"একদা আমি হযরত উয়াইস্ করনী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; দেখিলাম তিনি ফজরের নামাযে লিপ্ত আছেন। তিনি নামায শেষ করিলে আমি মনে করিলাম, এখন বাক্যালাপ করিত গেলে তাঁহার তসবীহ পাঠে ব্যাঘাত ঘটিবে। এইরূপ ভাবিয়া আমি ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলাম। তিনি স্বস্থানে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন, ক্ষণকালের জন্যও তথা হইতে উঠিলেন না। এমন কি তিনি সেই স্থানে যুহর ও আসরের নামায পড়িলেন। সেই অবস্থায় রজনী প্রভাতে দ্বিতীয় দিবসে তিনি ফজরের নামাযও তথায় পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার চক্ষে সামান্য তন্দ্রার ভাব আসিল। অকস্মাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে তিনি বলিতে লাগিলেন–'ইয়া আল্লাহ, নিদ্রাতুর চক্ষু ও ভোজনপটু উদরের দৌরাত্ম্য হইতে আমাকে রক্ষা কর।" আমি নিজে নিজে বলিলাম–'ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট।' তৎপর আমি কিছু বাক্যালাপ না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম।'

হযরত আবূ বকর আব্বাসী (র) একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাল শয়ন করেন নাই। এইরূপ অনিদ্রায় তাঁহার চক্ষে কালপানি নামিয়াছিল। কিন্তু বিশ বৎসর পর্যন্ত এই পীড়ার সংবাদ তিনি গৃহবাসী কাহাকেও জানিতে দেন নাই। তিনি প্রত্যহ পাঁচশত রাকাত নামায পড়িতেন। এবং যৌবনকালে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার বার সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন হযরত কর্য ইব্‌নে দব্‌রা (র) একজন আবদাল দিলেন। তিনি প্রত্যেহ তিনবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন। ইহাতে লোকে তাঁহাকে বলিল–"আপনি নিজের উপর বড় কঠিন কষ্ট চাপাইয়া লইয়াছেন।" তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"দুনিয়ার বয়স কত?" তাহারা বলিল–"সাত হাজার বছর।" তিনি পুনরায় বলিলেন–"কিয়ামতের এক এক দিন কত বড় হইবে?" তাহারা বলিল–"পঞ্চশ হাজার বছর।" তিনি বলিতে লাগেন–"আচ্ছা এমন লোক কে আছে, যে পঞ্চাশ দিনের আরাম পাইবার

আশায় সাত দিন কিছু কষ্ট সহ্য করে না? অর্থাৎ আমি যদি পূর্ণ সাত হাজার বছর জীবিত থাকি তবেও কিয়ামতের একদিন যাহা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, সেই এক দিনের কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য সাত হাজার বছর কষ্ট করি তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ হইবে। কিয়ামতের সেই দীর্ঘ বিচারের পরেও পরজগতে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, এই কথা আর কি বলিব? এমতাবস্থায় অনন্তকালের দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য জীবনের এই সামান্য কয়েকটা দিনের পরিশ্রম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন–"আমি এক রজনীতে হযরত রাবিয়ার (র) গৃহে যাইয়া দেখিলাম, তিনি স্বীয় উপাসনা-গৃহে নামাযে রত আছেন। ফজর পর্যন্ত তিনি নামাযে লিপ্ত ছিলেন। আমিও তাঁহার গৃহের এক কোণে নামায পড়িতেছিলাম। ফজরের পর আমি বলিলাম–"আল্লাহ্ আমাদিগকে সমস্ত রজনী নামায পড়িবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহার শুকরিয়া কিরূপে আদায় করিব?" তিনি বলিলেন–"আগামীকল্য রোযা রাখিয়া ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

রিয়াযতকারী সাধক বুযুর্গগণের কার্যপ্রণালী এইরূপ অসাধারণ ছিল। তদ্রূপ অসংখ্য কাহিনী আছে। এ-ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই সমস্তের সমাবেশ হইতে পারে না। "ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে বুযুর্গগণের তদ্রূপ বহু কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ লোকে তাঁহাদের ন্যায় সাধনা ও পরিশ্রম করিতে না পারিলেও পূর্বকালে বুযুর্গগণের জীবন যাপন প্রণালী মনোযোগের সহিত শুনিয়া নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি তো একবার বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ অন্তরে জন্মাইয়া লওয়া তো উচিত। তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা লাভ হইতে পারে।

মু'আতাবা (প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা)– মানব প্রবৃত্তি এমনভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহা সৎকর্ম হইতে পলায়ন করে এবং অপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। সৎকর্মে অলসতা এবং লোভ-লালসা-কামনাদি রিপু চরিতার্থ করা ইহার স্বভাব। প্রবৃত্তির স্বভাব হইতে এই দোষ দূর করিয়া ফেলিতে এবং ইহাকে বিপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিতে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ। কোন সময় কঠিন ব্যবহারে, কোন সময় কোমল ব্যবহারে, কখনও কর্মে, আবার কখনও বা উপদেশে প্রবৃত্তিকে সংশোধন করা যায়। কারণ, প্রবৃত্তির স্বভাব এই যে, কোন কার্যে লাভ দেখিলে সে ইহা সম্পন্ন করিলে প্রস্তুত হয়। এমন কি লাভজনক

কার্যনির্বাহ করিতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও উহা সহ্য করে। কিন্তু অধিকাংশ সময় অজ্ঞানতা ও অন্যমনস্কতা প্রবৃত্তির সম্মুখে এমন এক দুর্ভেদ্য পর্দার সৃষ্টি করে যে, তজ্জন্য কার্যের লাভ-লোকসান দেখিতে পায় না। অমনোযোগিতা হইতে জাগ্রত করত লাভ-ক্ষতি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে পারিলে প্রবৃত্তি লাভজনক কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এইজন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন; কেননা নিশ্চয়ই উপদেশ ঈমানদারগণের উপকার করে।" (সূরা যারিয়াত, ৩ রুকূ, ২৭ পারা।) তোমার প্রবৃত্তিও অপরের প্রবৃত্তির ন্যায় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং প্রথমে ইহাকে উপদেশ দেওয়া ও তিরস্কার করা আবশ্যক, বরং তিরস্কার কোন সময়ই বন্ধ করা উচিত নহে।

প্রবৃত্তিকে উপদেশ প্রদানের নিয়ম– প্রবৃত্তিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা উচিত–"হে প্রবৃত্তি, তুমি নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া দাবী কর। কেহ তোমাকে নির্বোধ বলিলে তুমি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হও অথচ তোমা অপেক্ষা অধিক নির্বোধ আর কেহই নাই। কারণ, যাহাকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য সেই নগরের তোরণ দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং অপর একজন সিপাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে, এমতাবস্থায় সেই আসামী যদি ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যাপৃত থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা নির্বোধ আর কে হইতে পারে? হে প্রবৃত্তি, মৃত ব্যক্তিগণ সৈন্য দলের ন্যায় নগর-দ্বারে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছে যে-পর্যন্ত তোমাকে সঙ্গে না লইবে সেই পর্যন্ত প্রস্থান করিবে না। বেহেশ্ত বা দোযখ তোমার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সৈন্যদল হয়ত আজই তোমাকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইবে। অদ্য না ধরিলেও একদিন না একদিন অবশ্যই তোমাকে ধরিবে এবং তাহাদের দলে তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। অতএব যাহা অবশ্যই ঘটিবে তাহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর। কেননা মৃত্যু কখন আসিবে তাহা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই–রাত্রিকে আসিবে, কি দিবসে–শীঘ্র আসিবে কি বিলম্বে–শীতকালে আসিবে কি গ্রীষ্মকারে আসিবে, কিছুই জানা নাই। মৃত্যু সকলকেই হঠাৎ আসিয়া লইয়া যায়। লোকে যখন নিতান্ত নিরুদ্বেগে থাকে তখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় তুমি যদি মৃত্যুর জন্য

প্রস্তুত না থাক তবে তোমা অপেক্ষা নির্বোধ আর কে হইতে পারে?

"হে মন, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তুমি সমস্ত দিন পাপে রত থাক। যদি মনে করিয়া থাক যে, আল্লাহ্ তোমার পাপ দেখিতেছেন না তবে তুমি কাফির। আর যদি জান যে, তিনি পাপ করিতে দেখিতেছেন এবং ইহা জানা সত্ত্বেও পাপ কর, তবে তুমি নিতান্ত দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ। তাঁহার চক্ষের উপর পাপ করিয়া চলিয়াছ, অথচ ভীত হইতেছ না। হে মন, একটু ভাবিয়া দেখ–তোমার গোলাম তোমার আদেশ লংঘন করিলে তুমি তাহার প্রতি কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাক। আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া তুমি কিরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিলে? যদি ধোঁকায় পড়িয়া মনে করিয়া থাক যে, আল্লাহ্র শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে তবে অল্পক্ষণের জন্য একটি অঙ্গুলী প্রদীপশিখার উপর ধরিয়া দেখ বা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত বালুকার উপর বসিয়া থাক অথবা ফুটন্ত গরম পানিপূর্ণ ডেগচির মধ্যে ডুব দাও, তাহা হইলেই তোমার অক্ষমতা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি ভাবিয়া থাক যে, তুমি যাহা করিতেছ তজ্জন্য আল্লাহ্র আইনে ধৃত হইবে না তবে তুমি কুরআন শরীফকে এবং এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ। কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ –

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি মন্দ কার্য করিবে সে ইহার শাস্তি পাইব।" (সূরা নিসা, ১৭ রুকূ, ৫ পারা।)

"হে প্রবৃত্তি, তুমি হয়ত বলিবে–'আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়ালু; তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন না।" ইহার উত্তর তুমি কান পাতিয়া শুনিয়া লও। সেই করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ কেন দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনাহারে মারিতেছেন এবং পীড়া ও বিপদাপদে নিপতিত করিতেছেন? বিনা বীজ বপনে তিনি শস্য দান করিতেছেন না কেন? হে মন, আল্লাহ্ তো করুণাময় ও দয়ালু। তবে কেন তুমি কাম্য ধন অর্জনের জন্য দুনিয়ার কৌশল ও উপায় অবলম্বন কর? সেই সময়ে কেন বল না–"আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়ালু। আমি পরিশ্রম করিয়া কষ্ট সহ্য করিব না। আল্লাহ্ স্বয় আমার কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবেন।' হে মন, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর শতদিক! হে মন, তুমি এখন হয়ত বলিবে–'আমি তর্কে হারিলাম, তুমি জিতিলে। তুমি সত্যই বলিতেছ। কিন্তু কি বলিব, আমি

যে পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।' রে নির্বোধ, তুমি এতটুকু জান না যে, যাহারা গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহাদের পক্ষে পরকালে দোযখের ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য সামান্য কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক? কারণ যে ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করে না সে যন্ত্রণা হইতেও বাঁচিতে পারে না। তুমি অদ্য এই সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছ না, বল তো কল্য কিয়ামতের দিন দোযখের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা লজ্জা-অপমান তিরস্কার-ভর্ৎসনা কিরূপে সত্য করিবে? হে নির্লজ্জ, ধনসম্পদ উপার্জন করতে কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাক এবং স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় এক বিধর্মী চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী সমস্ত অভিলাষের দ্রব্য পরিত্যাগ কর। কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে পারিলে না যে, দরিদ্রতা ও পীড়া অপেক্ষা দোযখের যন্ত্রণা অধিক কষ্টদায়ক এবং পরকালের অনন্ত জীবন ইহকালের জীবন অপেক্ষা অসীম।

"হে অবুঝ, তুমি বোধ হয় মনে করিতেছ যে, তওবা করিয়া সুপথে ফিরিবে, তৎপর সৎকার্য করিয়া লইবে। তওবা করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। তখন অনুতাপ অনুশোচনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইবে না। হে নফ্স, যদি তুমি ভাবিয়া থাক যে, অদ্য অপেক্ষা আগামীকল্য তওবা করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে, তবে ইহা তোমার মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যত বিলম্ব করিবে তওবা করা ততই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। পর্বতোপরি আরোহণের সময়ে বাহনের পশুকে বলবান করিবার উদ্দেশ্যে উদর পূর্তি করিয়া আহার করাইলে যেমন ফল পাওয়া যায়, মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তওবা করাও তদ্রূপ। আরোহণের পূর্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করাইলে পশু বলবান হইয়া উঠিত। ঠিক আরোহণের সময়ে আহার করাইলে কতটুকু বলবান হইবে? হে মন, তোমাকে এমন এক বিদ্যাশিক্ষার্থীর সহিত তুলনা করা যায় যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে; অথচ আলস্যবশত বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম না করিয়া সে আশা করিয়া রহিল যে, গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে বিশেষ পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা করত পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিবে। সে এতটুকু বুঝে না যে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইতে বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের আবশ্যক হয়।

হে অপবিত্রতাপূর্ণ নফস, তোমাকে তদ্রূপ দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি বিশুদ্ধ হইয়া আল্লাহ্র মহব্বত ও মারিফাতের উন্নত মকামে উপনীত হইতে পারিবে এবং ধর্মপথের বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহ

অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে। সমস্ত জীবন নিঃশেষ ও বৃথা নষ্ট করিয়া যখন আর অবকাশই পাইবে না তখন পরিশ্রম ও সাধনা করিবে কিরূপে? বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, পীড়ার অগ্রে স্বাস্থ্যকে, কর্মব্যস্ততার পূর্বে শান্তিকে, মৃত্যু না আসিতে জীবনকে অমূল্য জ্ঞানে কেন সদ্ব্যবহার করিলে না? হে মন, শীত আসিবার পূর্বে গ্রীষ্মকালেই শীতবস্ত্র সংগ্রহ কর কেন? তখন কেন আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত নিশ্চিন্ত থাক না? 'যমহরীর' নামক দোযখের শীত, 'চিল্লাবাসের শীত অপেক্ষা এবং দোযখের উষ্ণতা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠর উষ্ণতা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। দুনিয়ার শীত-গ্রীষ্ম নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তুমি কিছুমাত্র ত্রুটি কর না। কিন্তু পরকালের কার্যনির্বাহের বেলায় নানা ওযর-আপত্তি উত্থাপনপূর্বক অবহেলা কর। এরূপ ব্যবহারের কারণ হয়ত ইহাই যে, তুমি পরকালও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস কর না। এই প্রকার অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা তুমি স্বীয় অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছ এবং নিজকেও জানিতে দিতেছ না। ওহে নির্বোধ, ইহাই তোমার ধ্বংস ও দুঃখের কারণ হইবে।

হে মন, তুমি হয়ত বুঝিয়া রাখিয়াছ যে, মারিফাতের নূরে তুমি নিজকে সজ্জিত করিতে না পারিলেও মৃত্যুর পর লালসা-কামনাদি রিপুর অগ্নি তোমার প্রাণ দগ্ধ করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তি নিজে নিজে ভাবিতে লাগিল যে, আমি শীতবস্ত্র পরিধান না করিলেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মাঘের শীত আমার শরীর স্পর্শ করিবে না। এই ব্যক্তি এত বড় বোকা যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কাহাকে বলে তাহাও সে বুঝে না। আল্লাহ্‌ই শীত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র নির্মাণের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন ও সেই শীতবস্ত্র নির্মাণের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ইহাকেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলে। শীতবস্ত্র পরিধান না করিলেও শীত না লাগাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলে না। হে মন, তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে পাপকার্য করিলে আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাস্তি দিবেন, এবং তজ্জন্য তোমার মনে এই ধারণা উদয় হইয়া থাকে যে, আমি পাপ করিলে আল্লাহ্‌র কি ক্ষতি যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন? তবে তুমি ভুলে পতিত হইয়াছ। কেননা আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণে শাস্তি হইবে না। বরং তোমার বাসনা-কামনাদি রিপুই তোমার মধ্যে দোযখের অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। দেখ বিষ বা কোন ক্ষতিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে লোকের শরীরে পীড়া জন্মে এবং তজ্জন্য কষ্টও ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক তদ্রূপ

বস্তু ভক্ষণে নিষেধ করেন বটে কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন-জনিত ক্রোধ সেই ব্যক্তির পীড়া ও কষ্টের কারণ নহে। হে নফ্‌স, তোমার বুদ্ধির উপর শত ধিক! তুমি দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও ভোগসম্ভোগের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ এবং সংসারের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছ। উহা ব্যতীত অন্য কিছুই তোমাকে আল্লাহ্ হইতে ভুলাইয়া রাখে নাই।

হে হতভাগ্য, বেহেশ্‌ত ও দোযখের প্রতি যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তবে মৃত্য যে অবশ্যই ঘটিবে, এই বিশ্বাস ত নিশ্চয়ই আছে। তুমি যখন মরিবে তখন দুনিয়ার সমস্ত ধনৈশ্বর্য ও সুখসম্ভোগ তোমা হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে। তখন তৎসমুদয়ের বিচ্ছেদের অগ্নি তোমার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিবে। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য, তদনুযায়ী কার্য করা না করা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমার ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ার মহব্বত স্বীয় অন্তরে প্রবল ও মযবুত করিয়া লইতে পারে। তবে এতটুকু জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যে পরিমাণে বলবান হইবে, বিচ্ছেদ-যাতনা সেই পরিমাণে তীব্র হইয়া উঠিবে।

হে মন, আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়েত করুন। সংসারের পশ্চাতে দৌড়িয়া তুমি কেন ধ্বংস হইতে চলিয়াছ? সসাগরা ধরার আধিপত্য যদি তুমি লাভ কর এবং সমস্ত জগত যদি তোমাকে সিজদা করিতে তাকে তথাপি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি ও তৎসমুদয় মাটিতে মিশিয়া যাইবে। পূর্ববর্তী নরপতিগণ যেমন এখন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ তোমার নাম-নিশানাও থাকিবে না। আবার সসাগর ধরার আধিপত্যও তুমি লাভ করিবে না, ইহার সামান্য অংশই হয়ত তোমার ভাগ্যে ঘটিবে। যতটুকু তুমি পাইবে তাহাও অপবিত্র, বিধ্বস্ত ও ক্ষণভঙ্গুর। এমন সাংসারিক রাজত্বের বিনিময়ে চিরস্থায়ী এবং অতি মনোরম বেহেশ্‌ত তুমি কিরূপে বিক্রয় করিতে পার? হে মন, ইহা বিশেষ বিবেচনা করিবার বিষয়–যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী বহুমূল্য হীরকের পরিবর্তে মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা খরিদ করে তাহার প্রতি তোমরা কিরূপ উপহাস কর? সমস্ত জগত মাটির ভাঙ্গা পেয়ালাসদৃশ। জানিয়া রাখ, এই পেয়ালা অকস্মাৎ তোমার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। পরকালের অনন্ত সৌভাগ্য চিরস্থায়ী বহুমূল্য হীরকতুল্য। পরকালের সেই সৌভাগ্যের বিনিময়ে এই ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক সুখ গ্রহণ করিলে এবং মৃত্যুকালে ইহাও ফেলিয়া পরলোকে গমন করিলে ও তথাকার অপরিসীম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিলে তজ্জন্য

কেবল ভীষণ অনুতাপ ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

ফলকথা, এই প্রকারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে সর্বদা উপদেশ সহকারে তিরস্কার করিতে থাকিবে। তাহা হইলে নিজ কর্তব্য সম্পন্ন হইবে। আবার অপরকে উপদেশ দিবার পূর্বে নিজকেই উপদেশ দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধু-চিন্তা (তাফাক্কুর)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ –

অর্থাৎ "এক ঘণ্টাকালের সাধু-চিন্তা এক বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফের বহু স্থানে তাফাক্কুর, তাদাব্বুর, নযর ও ই'তিবারের আদেশ দিয়াছেন। এই চারটি শব্দই প্রায় সমার্থবোধক। এই চারিটি কার্যের প্রকৃত অর্থ সৎবিষয় লইয়া চিন্তা করা। লোকে যে-পর্যন্ত সাধু-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় ও অবস্থা জানিতে না পারে এবং কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হয়, সেই বিষয় কি প্রকার ও তাহা অবলম্বনে চিন্তা করিলে কি লাভ হয়, এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারে, সেই পর্যন্ত ইহার ফযীলত জানিতে পারে না। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রথমে ইহার ফযীলত বর্ণনা করিব; পরে ইহার পরিচয় দিব; তৎপর কি উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে হয়, তাহা বলিব এবং পরিশেষে যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিন্তা করিতে হয়, তাহার সন্ধান দিব।

সাধু-চিন্তার ফযীলত –যে-কাজ এক ঘণ্টা করিলে সারা বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়, সেই কাজটির মরতবা কত উচ্চ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"কতক লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা করিতেছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন–"তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা কর, তাঁহার অস্তিত্ব অবলম্বনে চিন্তা করিও না। কারণ সেই তেজ তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না এবং তাঁহার মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিবে না।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন এবং রোদন করিতেছিলেন। আমি নিবেদন

করিলাম-"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ ত আপনাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিই দিয়াছেন, তথাপি আপনি রোদন করেন কেন?' তিনি বলিলেন-'আমি কিরূপে রোদন না করিয়া থাকিতে পারি? আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবারাত্রের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" (সূরা আলে ইমরান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।) তৎপর তিনি বলিলেন-'এই আয়াত যে-ব্যক্তি পাঠ করে অথচ উক্ত বিষয়সমূহ লইয়া চিন্তা করে না তাহার জন্য আফসোস।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল-"হে রূহুল্লাহ দুনিয়াতে আপনার ন্যায় আর কেহ আছে কি?" তিনি বলিলেন-"হাঁ, আছে; যাহার প্রত্যেক বচনই আল্লাহ্‌র যিকির এবং নীরবতা কেবল সদ্ভাব চিন্তনে ব্যয়িত হয় ও প্রত্যেক দৃষ্টিপাত হইতেই উপদেশ লাভ হয়, সেই ব্যক্তি আমার সমতুল্য।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন-"তোমার স্বীয় চক্ষুকে ইবাদতে অংশগ্রহণ করিতে দাও।" সাহাবাগণ (র) নিবেদন করিলেন- "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কিরূপে দিব?" তিনি বলিলেন-"কুরআন শরীফ দেখিয়া পাঠ কর, ইহার মর্ম লইয়া গভীরভাবে চিন্তা কর এবং ইহার অভিনব বিষয়বস্তু হইতে উপদেশ গ্রহণ কর, তবেই তোমার চক্ষু ইবাদতে অংশ গ্রহণ করিল।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন-"পার্থিব বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে পরকালের বিঘ্ন ঘটে। পক্ষান্তরে পরকালের বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে আত্মা সঞ্জীবিত হয় ও জ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়।"

হযরত দাউদ তায়ী (র) একদা রাত্রিকালে স্বীয় গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া গগনমণ্ডলের বিষয় অবলম্বনে চিন্তামগ্ন হইয়া রোদন করিতেছিলেন। রোদন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তিনি প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন। প্রতিবেশী চোর আসিয়াছে বিবেচনায় তলওয়ার খুলিয়া অগ্রসর হইল এবং তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল-"আপনাকে কে ফেলিয়া দিল?" তিনি বলিলেন-"আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই বলিতে পারি না।"

সাধু-চিন্তার পরিচয়-'তাফাক্কুর' শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান অনুসন্ধান করা অর্থাৎ নূতন জ্ঞান লাভের উপায় অবলম্বন করা।

নূতন নূতন জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা-যে-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নহে তাহা পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব। কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পূর্বসঞ্চিত দুইটি জ্ঞান একত্রে সংযোগ করা আবশ্যক। তাহাতে দুই জ্ঞানের মিলনে একটি নূতন তৃতীয় জ্ঞান জন্মলাভ করিতে পারে। নরনারীর একত্র মিলনে যেমন সন্তান জন্মে, জ্ঞান উৎপত্তির নিয়মও ঠিক তদ্রূপ। যে-দুই মূল জ্ঞানের সংযোগে নব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহাদিগকে সেই নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের দুইটি মূল বলা যায়। উক্ত নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের সঙ্গে অপর একটি জ্ঞান মিলাইয়া দিলে অন্য একটি চতুর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ একটি জ্ঞানের সহিত অপর জ্ঞান ক্রমশ মিলাইতে থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান-বংশ অসীমরূপে বর্ধিত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানার্জনে অক্ষমতার কারণ-কোন কোন লোক তদ্রূপ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না। ইহার দুইটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ-নূতন নূতন জ্ঞানোৎপাদক মৌলিক জ্ঞানের অভাব। বণিক যেমন মূলধন বা পাইলে ধন উপার্জন করিতে পারে না, তদ্রূপ মৌলিক জ্ঞানরূপ মূলধন না পাইলে কেহই নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ-মৌলিক জ্ঞান অর্জিত হইলেও অনেকে দুই দুইটি জ্ঞানকে একত্র মিলাইবার কৌশল না জানাতে নুতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না। যেমন, যে-ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কৌশল না জানে তাহার প্রচুর মূলধন থাকিলেও সে ধনোপার্জনে অক্ষম হয়।

জ্ঞানার্জনে অক্ষমতার বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত। তথাপি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট' এই কথাটি যে-ব্যক্তি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চায় তাহাকে তৎপূর্বলব্ধ দুইটি জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। তন্মধ্যে একটি-'যাহা স্থায়ী তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট'; অপরটি-'পরকাল স্থায়ী এবং দুনিয়া অস্থায়ী'। এই দুইটি জ্ঞান যদি পূর্ব হইতেই সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদিগকে একত্র মিলন করা যায় তবেই 'দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট' এই জ্ঞানটি অতি সহজেই মনে জন্মিবে। কিন্তু উক্ত দুইটি জ্ঞান পূর্ব হইতে সঞ্চিত না থাকিলে শেষোক্ত জ্ঞানটি কখনই জন্মিতে পারে না। এস্থলে যাহা বর্ণিত হইল তাহাতে আমরা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের

মতের পোষকতা করিতেছি না। যাহাই হউক, এই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাও অত্যন্ত বিস্তৃত।

ফলকথা, পূর্বলব্ধ দুইটি জ্ঞানের মিলনে হৃদয়ে যে অপর একটি নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই তাফাক্কুরের বাস্তবিক অর্থ। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঘোটক-ঘোটকীয় সংযোগে যেমন অশ্ব শাবকই জন্মে, ছাগশিশু উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানের মিলনে সেই জাতীয় জ্ঞান পাওয়া যায়–এক জাতীয় দুই জ্ঞানের মিলনে ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আবার বিভিন্ন রকমের দুই জ্ঞান হইতে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের জন্য সেই জাতীয় দুইটি মূল জ্ঞান একত্র করা আবশ্যক। অভিলষিত জ্ঞানের সমশ্রেণীর দুইটি মূল জ্ঞান যে-পর্যন্ত হৃদয়ে একত্র করিতে না পারিবে, সেই পর্যন্ত বাঞ্ছিত জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা হৃদয়ে জন্মিবে না।

সাধু-চিন্তার উদ্দেশ্য–আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই তাহার একটি আলোকের আবশ্যক যাহাতে সেই আলোকের সাহায্যে সে অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া স্বীয় গন্তব্যপথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ইহারই প্রভাবে জানিতে পারে–তাহাকে কোন্ কাজ করিতে হইবে, কোন পথ দিয়া চলিতে হইবে–পার্থিব পথ দিয়া চলিতে হইবে না পারলৌকিক পথ দিয়া? কাহার প্রতি আসক্ত হইতে হইবে? নিজের প্রতি আসক্ত হইবে কি আল্লাহ্র প্রেমে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে? জ্ঞানের আলোক ব্যতীত মানব এই সমস্ত কথা জানিতে পারে না এবং তাফাক্কুর ব্যতীত জ্ঞানালোক লাভ করা যায় না; যেমন হাদীস শরীফে উক্ত আছে–

خُلِقَ الْخَلْقُ فِى ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُّوْرِهٖ –

অর্থাৎ "অন্ধকারের মধ্যে মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তৎপর তাহার উপর আল্লাহ্র নূরের ছিটা বর্ষিত হইয়াছে।"

পথিক অন্ধকারে পড়িলে যখন দিশাহারা হইয়া চলিতে পারে না, তখন সে লৌহদ দ্বারা চক্‌মকি পাথর ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করত প্রদীপ জ্বালিয়া লয়। প্রদীপ জ্বালিলে আলোকের সাহায্যে সে যেমন চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা দেখিতে পায়, কষ্টকর অবস্থা দূরীভূত হয়; কোন্‌টি সুপথ ও কোনটি বিপথ নির্বাচন করিয়া লইতে পারে এবং সরল পথ অবলম্বনে নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারে, মানবের

অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সে অন্ধকারময় দুনিয়াতে পতিত হইয়া কি করিবে, কোন্ দিকে যাইবে, বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নিরাপদে সুখের স্থানে পৌঁছিবার জন্য তাহারও একটি আলোকের নিতান্ত আবশ্যক। 'যাহা স্থায়ী তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট' এবং 'পরকাল স্থায়ী এবং দুনিয়া অস্থায়ী' এই দুইটি জ্ঞানের একটি প্রস্তর ও অপরটি লৌহদণ্ড সদৃশ। তাফাক্কুর (চিন্তা) প্রস্তরোপরি লৌহদণ্ডের আঘাতসদৃশ এবং চিন্তাসম্ভূত জ্ঞান আঘাতে উৎপন্ন আলোকতুল্য। এইরূপ আলোকপ্রাপ্ত হইলেই মানবের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তৎসঙ্গে তাহার কার্যকলাপেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, যখন সে বুঝিতে পারে যে, দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উৎকৃষ্ট তখন দুনিয়া হইতে পরান্মুখ হইয়া পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে।

সাধু-চিন্তা সর্ববিধ সৎকর্মের মূল কারণ–উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, সাধু-চিন্তা হইতে মারিফাত (পরিচয়-জ্ঞান), হালাত (অবস্থা) এবং আমলের উৎপত্তি হয়। যেমন, পরজগত স্থায়ী, আর ইহজগত অস্থায়ী–এই দুইটি মৌলিক জ্ঞানকে সংযোগ করাই হইল তাফাক্কুর বা সাধু-চিন্তা। এই সংযোজনার ফলে 'পরকাল ইহকাল হইতে উত্তম' এই কথাটি আমরা জানিতে পারি। ইহাই হইল মারিফাত বা পরিচয়-লাভ। এই পরিচয়-লাভের ফলে আমাদের অন্তরে ইহকালের প্রতি অনাকর্ষণ ও পরকালের প্রতি আকর্ষণের উৎপত্তি হইবে। ইহাই হইল হালাত বা অবস্থা। এই অবস্থার ফলে আমরা পরকালের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে বদকাজ বর্জন করত নেককাজে মনোনিবেশ করি। ইহাই হইল আমল বা কাজ। ইহা হইতেই তাফাক্কুরের ফযীলত প্রতিপন্ন হয়। কেননা, তাফাক্কুরই হইল সর্ববিধ সৎকর্মের কারণ বা কুঞ্জী।

তাফাক্কুরের পটভূমি–তাফাক্কুরের পটভূমি নিতান্ত প্রশস্ত। কারণ, জ্ঞানের কোন সীমা নাই। দুনিয়ার প্রত্যেক পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা করিলে নব নব জ্ঞানের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় ধর্মপথের সহিত সম্বন্ধ রাখে না, তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল ধর্মপথের সহিত সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হইবে। ইহার ব্যাখ্যাও নিতান্ত বিস্তৃত; তথাপি ইহাকে কয়েকটি ভাগে বিভিক্ত করিয়া তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে।

যে-সকল ব্যবহার বা কার্য আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাকেই এস্থলে আমরা ধর্মপথ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। কেননা যে-পথ অবলম্বন করিলে মানব আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে একমাত্র ইহাই তাহার গন্তব্যপথ।

ধর্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার পটভূমির বিভাগ–মানুষের চিন্তার পটভূমি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, যথা–নিজের সম্বন্ধে ও আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে। আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে চিন্তার পটভূমিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) তাঁহার 'যাত ও সিফাত' অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া চিন্তা করা এবং (খ) আল্লাহ্‌র কার্যাবলী ও তাঁহার বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল অবলম্বনে চিন্তন। নিজের সম্বন্ধে চিন্তার পটভূমিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) নিজের সেই দোষসমূহ যাহা আল্লাহ্‌র অপ্রিয় ও যাহা হইতে মুক্ত না হইল আল্লাহ্ হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। এইরূপ দোষগুলিকে পাপ ও ধ্বংসকর দোষ বলে। (খ) মানুষের কতকগুলি গুণ যাহা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও যাহা কল্যাণে মানুষ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। এইগুলিকে পুণ্য ও পরিত্রাণকারী গুণ বলে। অতএব চিন্তার পটভূমি উপরিউক্ত চারি ভাগে বিভক্ত হইল।

ধর্মপথ যাত্রীর সহিত প্রেমাসক্ত ব্যক্তির তুলনা–ধর্মপথ-যাত্রীর অবস্থা প্রেমাসক্ত ব্যক্তির তুল্য। প্রেমাসক্ত ব্যক্তির চিন্তা প্রিয়জনের দিক ভিন্ন অন্যদিকে ধাবিতই হয় না। তাহার মন অন্যদিকে ধাবিত হইলে তাহার প্রেমকে প্রকৃত পূর্ণ প্রেম বলা চলে না। প্রেমের পূর্ণ উন্নতি হইলে ইহা এইরূপে প্রেমিকের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসে যে, সেই হৃদয়ে অপর কিছু প্রবেশের স্থান থাকে না। প্রেমিক হয়ত প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অথবা তাহার গুণ ও কার্যাবলী চিন্তনে নিমগ্ন থাকে। প্রেমিক নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এবং সদ্‌গুণরাজির দিকে লক্ষ্য করে যাহা তাহাকে প্রেমাস্পদের নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলে এবং সেই সদ্‌গুণসমূহ অর্জনে প্রবৃত্ত হয়, অথবা প্রেমাস্পদের অপ্রিয় দোষসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া উহা বর্জনের চেষ্টা করে। প্রেমাসক্ত লোকের চিন্তার পটভূমি যেমন চারিভাগে বিভক্ত, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমাসক্ত ধর্মপথ যাত্রীর চিন্তার ময়দান তদ্রূপ চতুর্বিধ।

ধর্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম পটভূতি–নিজের স্বভাব ও কার্য সম্বন্ধে দোষগুণ চিন্তন। সর্বপথমে চিন্তা ও অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে, নিজের স্বভাবে কোন্ কোনটি মন্দ এবং কার্যাবলী মধ্যে কোন্ কোনটি দুষণীয়। মন্দ বা দুষণীয় কিছু থাকিলে তাহা হইতে নিজকে পবিত্র করিতে হইবে। এইগুলি প্রকাশ্য পাপ ও গুপ্ত মন্দ স্বভাব। পাপ ও মন্দ স্বভাব অসংখ্য। পাপের মধ্যে কতকগুলি কার্য সপ্ত অঙ্গের সাহায্যে করা হয়; যথা–রসনা, চক্ষু, হস্তপদ ইত্যাদি, এবং কতকগুলি কার্য সমস্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখে। অন্তরের মন্দ স্বভাবসমূহের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

কার্য ও স্বভাব অবলম্বনে চিন্তার ত্রিবিধ ধাপ– কার্য ও স্বভাব অবলম্বনে চিন্তা করিবার তিনটি ধাপ আছে; যথা– (১) অমুক কাজ বা স্বভাব ভাল কি মন্দ অনুসন্ধান করিয়া দেখা। চিন্তা ব্যতীত ইহা বুঝা যায় না (২) ঐ প্রকার মন্দ কার্য আমি করিতেছি কিনা এবং ঐ প্রকার মন্দ স্বভাব আমার মধ্যে আছে কিনা অনুসন্ধান করা। প্রবৃত্তির দোষগুণও চিন্তা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না। (৩) নিজের মধ্যে যে যে মন্দ স্বভাব আছে বলিয়া বুঝা যায়, উহা বিদূরিত করিবার উপায় চিন্তার প্রভাবে স্থির করিয়া লওয়া। সুতরাং প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছুক্ষণ ঐ প্রকারে আত্মপরীক্ষার জন্য চিন্তা করা আবশ্যক।

আত্মপরীক্ষার জন্য চিন্তার ধারা–প্রথমে প্রকাশ্য পাপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবে। এইজন্য এক একটি কর্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; যথা–অদ্য আমার রসনা হইতে কিরূপ কথা নিঃসৃত হইবে। হয়ত গীবত ও মিথ্যা কথনে লিপ্ত হইয়া পড়িব। অতএব উহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা চিন্তার সাহায্যে অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপ হারাম ভক্ষণের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে তাহা হইতে বাঁচিবার উপায় চিন্তাপূর্বক স্থির করিয়া লইতে হইবে। ফলকথা, রসনা দ্বারা যে-সকল পাপ ঘটিতে পারে, একে একে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করত অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচার আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে যে পাপ সংঘটিত হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করত উহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় অবলম্বন করিবে। পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কি কি ইবাদত করা যাইতে পারে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া উহা সম্পাদনে তৎপর হইবে। ইবাদত সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চিন্তার পর কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কিরূপ অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিবে এবং তৎসমুদয় কাজও সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

কর্মেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কিরূপে অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ করা যাইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত এই—মনে মনে চিন্তা করিবে, আল্লাহ্‌র যিকির ও মঙ্গলজনক প্রীতিকর কথা বলিয়া অপরকে শান্তি প্রদানের জন্য রসনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি অমুক যিকির করিতে পারি এবং অমুকের শান্তির জন্য আমি অমুক সুকথা বলিতে সমর্থ। চক্ষুকে ধর্মের ফাঁদস্বরূপ বানানো হইয়াছে যেন ইহার সাহায্যে সৌভাগ্যরূপ শিকার ধরিয়া লইতে পারি এবং অমুক আল্লাহ্‌র প্রিয় আলিমের প্রতি ভক্তিসহকারে দৃষ্টিপাত করিতে ও ফাসিকের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে

অবলোকন করিতে পারি। তাহা হইলে চক্ষের কর্তব্য সম্পন্ন হইবে। মুসলমানগণের আরাম সাধনের জন্য ধন সৃষ্ট হইয়াছে। এই ধন অমুক ব্যক্তিকে দান করিতে পারি এবং নিজ কার্যে ব্যয় না করিয়া অপরের অভাব মোচনে ব্যয় করিতে পারি। এইরূপ এবং এই ধরনের চিন্তা প্রত্যহ করিলে হয়ত এক ঘণ্টার চিন্তার ফলে হৃদয়ে এমন সুপ্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে যাহা মানবকে চিরজীবন পাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইজন্যই এক ঘণ্টার চিন্তাকে সারা বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। কেননা ইহার ফল যাবজ্জীবন স্থায়ী থাকে।

প্রকাশ্য ইবাদত ও পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করিবে। তোমার হৃদয়ে কোন্ কোন্ ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব আছে এবং পরিত্রাণকারী সদ্‌গুণের মধ্যে কোন্ কোনটি নাই, তাহা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মন্দ স্বভাবের মধ্যে যেগুলি দেখিতে পাইবে সংশোধন করিবে এবং যে সদ্‌গুণের অভাব দেখিবে তাহা অর্জনে তৎপর হইবে। মন্দ স্বভাব ও সদ্‌গুণ বহু এবং তৎসমুদয় লইয়া চিন্তা করিবার পথও নিতান্ত বিস্তৃত। কিন্তু মূল ধ্বংসকর মন্দ স্বভাব দশটি; যথা (১) কৃপণতা (২) অহংকার (৩) আত্মশ্লাঘা (৪) রিয়া (৫) ঈর্ষা (৬) ক্রোধ (৭) ভোজন-লিপ্সা (৮) অতিরিক্ত কথনের লোভ (৯) ধন-লালসা এবং (১০) সম্মান-লিপ্সা। এই দশটি মূল দোষ হইতে অব্যাহতি পাইলে লোকে বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তদ্রূপ পরিত্রাণকারী মূল সদ্‌গুণও দশটি; যথা– (১) তওবা (২) সবর (৩) আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তোষ (৪) কৃতজ্ঞতা (৫) আল্লাহ্‌র ভয় (৬) আল্লাহ্‌র রহমতের আশা (৭) সংসার-বিরাগ (৮) ইখলাস (একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) (৯) সর্বজীবের সহিত সদ্ব্যবহার এবং (১০) আল্লাহ্‌র মহব্বত।

উপরিউক্ত দোষ ও গুণ লইয়া চিন্তা করিতে গেলে চিন্তারাজ্যের অসীম ময়দান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চিন্তার এবংবিধ পথ সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় না। তবে এই সকল দোষ-গুণের পরিচয় এই গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয় যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, কেবল তদ্রূপ লোকের সম্মুখে সাধুচিন্তার পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ধর্মপথ-যাত্রীর জন্য উক্ত দশটি গুণের একট তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের নিকট রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে যে গুণটি অর্জিত হইয়া যায় ইহাতে একটি রেখাপাত করিয়া অপর একটি গুণ অর্জনে তৎপর হইতে হইবে। নিজের

ঐ সকল দোষ-গুণ লইয়া চিন্তা করিবার কালে কাহারও পক্ষে হয়ত কোন বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ সেই ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, কোন একজন পরহেযগার আলিম সমস্ত মন্দ স্বভাব হইতে নিস্তার পাইয়াছে, কিন্তু স্বীয় ইলমের জন্য বড়াই করেন; লোকের নিকট নিজের ইবাদত ও বাহ্য আকার প্রকার সাজাইয়া রাখেন; লোকে আলিম বলিয়া ভক্তি করিলে আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিলে নিন্দুকের প্রতি তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। এই সমস্ত ভাবই অন্তরের গোপনীয় দোষ এবং ধর্মজীবনের নিতান্ত অনিষ্টকর। তদ্রূপ আলোকে প্রত্যহ চিন্তা করা আবশ্যক, কি উপায়ে এই সমস্ত দোষ দূর করিয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং তাহার নিকট লোকের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সমান হইয়া পড়ে ও দৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই সকল বিষয়ে চিন্তার ময়দান নিতান্ত প্রসারিত। অতএব বুঝা গেল যে, মানব নিজের দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখিতে পাইবে যে, তদ্রূপ চিন্তার একটি অসীম ময়দান এবং এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এইজন্য কলম সংযত করিলাম।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী অবলম্বনে চিন্তার ময়দান অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মানব এই চিন্তা করিতে অক্ষম এবং তাহাদের বুদ্ধিও তত উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত (অস্তিত্ব ও গুণাবলী) লইয়া চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া হাদীস শরীফে উক্ত আছে–"আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত লইয়া চিন্তা করিও না; কারণ তোমরা তাহার যথার্থ মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইবে না।" মনে করিও না যে, আল্লাহ্‌র অপ্রতিহত প্রতাপ ও গৌরব গুপ্ত আছে বলিয়া লোকে তাহার যথার্থ মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম; বরং তাহার জ্যোতি এতই উজ্জ্বল ও প্রখর যে, দুর্বল মানব তাহা সহ্য করিতে পারে না। এইজন্যই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মানব বেহুঁশ ও দিশাহারা হইয়া পড়ে। দেখ, চামচিকা দিনের বেলা বাহির হয় না; ইহার কারণ এই যে, ইহার দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত দুর্বল, সূর্যের প্রখর জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য দিবাভাগে সূর্যের দিকে ইহারা দৃষ্টিপাত করে না; বরং সন্ধ্যাকারে সূর্য অস্ত গেলে সামান্য আলোকরশ্মি অবশিষ্ট থাকিলে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের অবস্থাও ঠিক চামচিকাসদৃশ। তাহারাও

আল্লাহ্‌র এত উজ্জ্বল জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না। কেবর সিদ্দীক ও বুযুর্গগণই উহা দর্শনের ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারাও সর্বদা দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। সর্বদা আল্লাহর জ্যোতি দর্শন করিতে গেলে তাঁহাদেরও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মানুষ যেমন সূর্যের দিকে তাকাইলে অন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র জ্যোতির দিকেও সর্বদা তাকাইলে মানুষ হতজ্ঞান ও পাগল হইয়া যাইতে পারে।

যাহাই হউক, আল্লাহ্‌র গুণরাজির যতটুকু আভাস বুযুর্গগণ পাইয়া থাকেন তাহাও সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যে সমস্ত কথায় মানুষের গুণেরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় তদ্রূপ উক্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা করার অনুমতি আছে, যথা–আল্লাহ জ্ঞানময়, ইচ্ছাময় এবং বাক-শক্তিমান। এইরূপ কথা বলিলে নিজ গুণের সমজাতীয় ভাবিয়া সাদৃশ্যের, সাহায্যে যৎসামান্য বুঝিয়া লইতে পারে। তবে আল্লাহ্‌র তদ্রূপ গুণ বর্ণনাকালে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র কথা মানুষের কথার ন্যায় অক্ষরে প্রকাশিত বা ধ্বনিময় নহে এবং তাঁহার বাক্যে সংযুক্তি বা অসংযুক্তি কিছু নাই। কিন্তু এই কথা বলিলে মানুষ হয়ত বুঝিতে পারিবে না এবং অবিশ্বাস করিয়া বসিবে ও ভাবিবে আল্লাহ্‌র বাক্য বিনা-অক্ষরে ও বিনা-ধ্বনিতে কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ তুমি যদি মানুষকে জানাও যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তোমাদের অস্তিত্বের ন্যায় নহে। কারণ, তিনি কোন পদার্থও নহেন; তিনি কোন স্থানের মধ্যে নহেন; আবার গুণাধার পদার্থও নহেন; তিনি কোন স্থানের মধ্যে নহেন, বা কোন স্থানের উপরেও নহেন; দিকের সহিত তাঁহার কেনা সংশ্রব নাই। জগতের সহিত তিনি সংযুক্তও নহেন আবার পৃথকও নহেন; তিনি জগতের ভিতরেও নহেন আবার বাহিরেও নহেন। এই সমস্তও তুমি হয়ত অসম্ভব ভাবিয়া অবিশ্বাস করিয়া বসিবে। কারণ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে তুমি স্বীয় অস্তিত্বের ন্যায় অনুমান করিয়া তাহার অসীম গৌরব ও অনন্ত প্রতাপ বুঝিতে পার না। লোকে মানব সমাজে কেবল সম্রাটের গৌরব ও প্রতাপ দেখিয়া থাকে–সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং গোলামগণ তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ বুঝিবার সময়ও উক্ত পরিজ্ঞাত রাজসভার প্রত্যেক বিষয় ও পদার্থের সাদৃশ্যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা অসম্ভব কল্পনা আঁকিয়া লয় এবং মনে করে নিশ্চয়ই পার্থিব সম্রাটের ন্যায় আল্লাহ্‌র হস্ত-পদ, চক্ষু, মুখ, রসনা আছে। কেননা লোকে নিজের

মধ্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে দেখিয়া মনে করে, আল্লাহ্‌র মধ্যে এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকা ত্রুটির বিষয়। মাছিরও এইরূপ সাধারণ লোকের ন্যায় বুদ্ধি থাকিলে ইহারাও মনে করিত, অবশ্যই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রও পাখা এবং পালক আছে; কেননা যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের বল ও স্বচ্ছন্দতার কারণ, সেই সমস্ত আল্লাহ্‌র না থাকা অসম্ভব কথা। এইরূপ মানুষও প্রত্যেক বিষয় নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনুমান করে। এইজন্যই আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ আছে।

প্রাচীন বুযুর্গগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ জগতের ভিতরেও নহেন, বাহিরেও নহেন; তিনি জগতের সহিত সংযুক্তও নহেন, আবার পৃথকও নহে'–এই কথা পরিষ্কারভাবে বলাও তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন নাই। বরং তাঁহারা কুরআন শরীফের এই কথা বলিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতেন–لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ অর্থাৎ "কোন বস্তু তাঁহার তুল্য নহে।" (সূরা শুরা, ২ রুকূ, ২৫ পারা)

কোন বস্তু আল্লাহ্‌র তুল্য নহে এবং তিনিও কোন বস্তুর তুল্য নহেন। তাঁহারা সংক্ষেপ এই কথা বলিয়াই চুপ থাকিতেন–সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিতেন না। তাঁহারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে খুলিয়া বর্ণনা করাকে বি'দআত মনে করিতেন। কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি উহার বিস্তৃত বিবরণ ও অর্থ অনুধাবন করিতে অক্ষম। এই কারণেই কোন কোন পয়গম্বরের (আ) উপর ওহী নাযিল হইয়াছিল–"আমার বান্দাগণের নিকট আমার গুণের পরিচয় খুলিয়া বলিও না; কারণ তাঁহারা অবিশ্বাস করিতে পারে। তাহারা যতটুকু বুঝিবার শক্তি রাখে তাহাদের সঙ্গে তদ্রূপ কথা বল।"

যাহাই হউক, কামিল বুযুর্গগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া আলোচনা ও চিন্তা না করাই ভাল, এমন কি কামিল বুযুর্গগণও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণ চিন্তা করিতে গিয়া চমকিত ও বুদ্ধিহারা হইয়া পড়েন। এইজন্য আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল দর্শনপূর্বক তাঁহার প্রতাপ ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া উচিত। কারণ, বিশ্বজগতে যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎসমুদয় তাঁহার অসীম মহত্ত্ব ও কুদরতের একটি আলোক হইতে প্রকাশিত। প্রখর প্রতাপবিশিষ্ট সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লোকে অক্ষম হইলেও ভূপৃষ্ঠে যে-কিরণ পরিব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়, ইহা দর্শন করিবার ক্ষমতা অবশ্যই তাহার আছে।

আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা–বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর ও অদ্ভূত সৃষ্ট শিল্প পদার্থ। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ এমন কি আকাশ-পাতাল ও তদন্তর্গত প্রত্যেক বালুকা কণা পর্যন্ত নিজ নিজ ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতার স্তুতি পাঠ করিতেছে–তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছে। ঐ সমস্ত বিস্ময়কর পদার্থ এত অসীম যে, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইতে পারে না। যদি জগতের সমস্ত জলাশয় ও সমুদ্রের পানি লিখিবার কালি হইত এবং সমস্ত বৃক্ষ-গুল্মাদি কলম হইত ও সমস্ত প্রাণী লিখক হইত এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া লিখিত তথাপি সৃষ্ট পদার্থে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র জ্ঞান, কৌশল ও ক্ষমতার প্রকৃত অবস্থা অতি সামান্যই লিখিতে পারিত। যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি বলিয়া দেন যে, যদি আল্লাহ্‌র মহিমাসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্র-পানি কালি হয় অবশ্যই তাঁহার মহিমা বাক্য সকল সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সমুদ্রের পানি ফুরাইয়া যাইবে এবং যদি সমস্ত সমুদ্রের পানি পরিমিত আরও কালি আনিয়া দেই তাহাও ফুরাইয়া যাইবে। (সূরা কাহাফ, ১২ রুকূ, ১৬ পারা।)

সৃষ্ট পদার্থ মোটামুটি দুই প্রকার। ইহার মধ্যে এক প্রকার পদার্থের খবর আমরা আদৌ পাইতে পারি না। সুতরাং তৎসমুদয়ের চিন্তা আমরা কি প্রকারে করিতে পারি? যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ –

অর্থাৎ "সব মহিমা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে জোড়া পয়দা করিয়াছেন। যাহা যমীন হইতে উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এবং মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং যাহা তাহারা জানে না তাহার মধ্যেও।" (ইয়াসীন, ৩ রুকূ, ২৩ পারা।) আবার যে প্রকার পদার্থ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পদার্থ আমরা দেখিতে পাই না,

যথা–আরশ, কুর্সী, ফিরিশতা, জিন ইত্যাদি। এইরূপ অদৃশ্য পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা করিবার ধরন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। যে সমস্ত পদার্থ আমরা দেখিতে পাই তৎসমুদয় লইয়া কি প্রকারে চিন্তা করিতে হয়, ইহার পন্থা দেখাইয়াই আমরা নিরস্ত হইব।

দৃশ্যমান পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা–দৃশ্যমান পদার্থ যেমন, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ পদার্থ যথা–পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নগর, ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ ও মণি-মাণিক্যাদি এবং ভূতলস্থ নানা প্রকার উদ্ভিদ লতা এবং জলচর স্থলচর খেচর ইতর জীবজন্তু হইতে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই চিন্তার বিষয়। এই সকলের মধ্যে মানব সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। এতদ্ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, রামধনু এবং যে নিদর্শনাবলী আকাশ ও বায়ুমণ্ডলে দেখা দেয় ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ, সকলই চিন্তার বিষয়। এই সমস্তই আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্ট পদার্থ। এই সকল পদার্থের কতকগুলি অবলম্বনে কিরূপে চিন্তা কিরতে হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হইতেছে। এই সমস্তই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এই সকলের প্রতি লক্ষ্যপূর্বক উহা লইয়া চিন্তা করিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন; যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ –

অর্থাৎ "আকাশে ও ভূমণ্ডলে কত নিদর্শন রহিয়াছে যে উহার সম্মুখ দিয়া তাহারা যাতায়াত করিতেছে, অথচ তৎপতি তাহারা উদাসীন।" (সূরা ইউসুফ, ১২ রুকূ, ১৩ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ –

অর্থাৎ "তাহারা কি গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তু যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না?" (সূরা আরাফ, ২৩ রুকূ, ৯ পারা।) আল্লাহ্ পুনরায় বলেন ঃ

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে অবশ্য বুদ্ধিমান লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" সূরা আলে ইম্‌রান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।) যাহাই হউক, এইরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে। সেই সকল লইয়া চিন্তা করা কর্তব্য।

মানবদেহ অবলম্বনে চিন্তা–আল্লাহ্ তা'আলার ঐ অগণিত নিদর্শনের প্রথম নিদর্শন যাহা তোমার নিকটবর্তী তাহা তুমি নিজেই। বিশ্বজগতে তোমা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর আর কিছুই নাই, অথচ তুমি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে উদাসীন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ "হে মানব, তোমরা নিজের সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও প্রতাপ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

মানবদেহের উৎপত্তি ও বিকাশ– প্রিয় পাঠক, প্রথমে তুমি নিজের আদিম অবস্থার বিষয় চিন্তা কর–তুমি কোথা হইতে আসিলে? আল্লাহ তোমাকে এক বিন্দু পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পানি সর্বপ্রথমে পিতার পৃষ্ঠে ও মাতার বক্ষে তোমার জন্মের বীজস্বরূপ সংরক্ষিত ছিল। ইহার পর কামভাবকে মাতাপিতার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নারীর জরায়ুকে ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষের পৃষ্ঠস্থিত পানিকে বীজসদৃশ করা হইল। নরনারীর মনে কামভাব উত্তেজনা দিতে আরম্ভ করিলে পুরুষের পৃষ্ঠ ও নারীর বক্ষ হইতে শুক্র স্খলিত হইয়া বীজস্বরূপ জরায়ু ক্ষেত্রে গিয়া নিপতিত হইল। তৎপর ঋতু-রক্তবিন্দু দ্বারা এই বীজকে সিঞ্চন করা হইল। এইরূপে শুক্র-বিন্দু ও হায়েযের রক্ত দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমে এই বীজ একটি জমাট রক্তখণ্ডে পরিণত হয়। পরে এই জমাট রক্ত মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে। পরিশেষে ইহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, এক বিন্দু শুভ্র পানি ও লোহিত পানির মিশ্রণ হইতে তোমার মধ্যে কত বিভিন্ন পদার্থ, যথা- গোশ্‌ত, চর্ম, রগ, শিরা এবং অস্থি প্রস্তুত হইয়াছে। তৎপর এই সমস্ত দ্বারা তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার গঠিত হইয়াছে। মস্তক গোলাকার করা হইয়াছে

এবং হস্তপদ লম্বা করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। হস্তপদের প্রান্তভাগে পাঁচ পাঁচটি অঙ্গুলী বানানো হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, জিহবা ইত্যাদি অঙ্গগুলি দেহের বহির্ভাগে সাজানো হইয়াছে এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগে উদর, হৃদপিণ্ড, মূত্রাশয়, গুহ্য, জরায়ু ও নাড়ীভূঁড়ি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ–মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকার, গুণ ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক এবং আয়তনও ভিন্ন প্রকার। আবার ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অঙ্গুলীকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি গ্রন্থিযুক্ত করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন। গোশ্‌ত, চর্ম, রগ, শিরা ও অস্থিযোগে তিনি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাজাইয়াছেন। তোমার চক্ষু-গোলক পরিমাণে ও আয়তনে একটি আখরোট অপেক্ষা বড় নহে; তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে সাতটি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিটি বিভাগের কার্য ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক। ইহাদের মধ্যে যদি এক ভাগও নষ্ট হইয়া যায়, তবে পৃথিবীর কোন পদার্থই তুমি দেখিতে পাইবে না। যাহাই হউক, কেবল চক্ষুর বিস্ময়কর অবস্থা এবং আশ্চর্যজনক কার্য বর্ণনা করিতে গেলেও এক বিরাট গ্রন্থ রচিত হইবে।

অস্থি–অনন্তর তোমার অস্থিসমূহের প্রতিও মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখ। এইগুলি নিতান্ত শক্ত হইলেও তরল পানি হইতে বানানো হইয়াছে। উহার প্রত্যেক জোড় ও টুকরার আকার, গঠন ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের–কোন হাড় গোলাকার, কোনটি লম্বা, কোনটি চওড়া, কোনটি শূন্যগর্ভ, আবার কোনটি ছিদ্রহীন। এই সমস্ত হাড় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির পরিমাণ, আকার ও গঠনের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল রহিয়াছে, এমন কি বহু উদ্দেশ্য ও কৌশল নিহিত আছে। অস্থিসমূহকে তোমার দেহ-গৃহের স্তম্ভস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। অস্থিগুলি খণ্ডিত না করিয়া ও পরস্পর জোড় না লাগাইয়া যদি একটানাভাবে আস্ত প্রস্তুত করা হইত, তবে পিঠ ঝুঁকাইতে এবং মস্তক নত করিতে পারা যাইত না। আবার সেইগুলি খণ্ডিত হইলে অথচ পরস্পর জোড় লাগানো না হইলে পিঠ সোজা করিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো যাইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক খণ্ড হাড়ের সহিত শিরা ও স্নায়ু দ্বারা অপর এক খণ্ডের জোড় দেওয়া হইয়াছে। হাড়গুলির এক প্রান্তে চারিটি গোল বর্তুলাকৃতি দাঁত এবং অন্য প্রান্তে সেই দাঁত ঠিকরূপে বসিতে পারে এমন চারিটি

গর্তাকৃতি খাঁজ কাটা হইয়াছে। এক খন্ড হাড়ের প্রান্তস্থিত বর্তুল অন্য খণ্ডের প্রান্তস্থিত গর্তাকৃতি খাঁজের মধ্যে সুন্দরভাবে বসে। নত করিলে বা হেলাইলে ঐ অস্থিখণ্ডের এক প্রান্ত কনুই-প্রান্তের ন্যায় সামান্য বাহির হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, স্নায়ু-সূত্র, মাংসপেশী, রগ এবং শিরা দ্বারা সেই খণ্ডের জোড়া মযবুতভাবে রাখা হইয়াছে। এইজন্য একেবারে স্থানচ্যুত হয় না।

মস্তক– এইরূপ তোমার মাথার খুলি পঞ্চান্নটি অস্থিখণ্ডের সংযোগে নির্মিত হইয়াছে। এই সমস্ত জোড় সূক্ষ্ম সেলাই দ্বারা টাঁকা আছে। এইরূপ জোড় থাকাতে খুলির এক অংশে কোন দুঃখ পাইলে অপর অংশ নিরাপদে থাকে এবং মস্তক সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায় না।

দাঁত– দাঁতের সৃজন কৌশলের প্রতি লক্ষ্য কর। কতকগুলি দাঁতের মাথা বেশ চওড়া; উহার উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া চিবানো যায়। অপর কতকগুলি দাঁতের মাথা ছুরি ধারের ন্যায় পাতলা এই সকল দাঁতের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্তনপূর্বক পার্শ্বস্থ প্রশস্ত-মস্তক দাঁতের উপর চর্বণের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন খাদ্যদ্রব্য পিষিবার জন্য জাঁতির উপর দেওয়া হইতেছে।

গ্রীবা ও মেরুদণ্ড– তোমার গ্রীবা সাত খণ্ড অস্থি সংযোগে নির্মাণ করা হইয়াছে এবং শিরা, ধমনী ও স্নায়ুসূত্রে জড়াইয়া ইহাকে দৃঢ় করা হইয়াছে। তৎপর গ্রীবার উপরিভাগে মস্তক স্থাপন করা হইয়াছে। মেরুদণ্ড চব্বিশটি অস্থিখণ্ড সহযোগে নির্মিত হইয়াছে এবং ইহার উপর অংশে গ্রীবা রক্ষিত হইয়াছে। আবার লক্ষ্য করিয়া দেখ, পঞ্জরাস্থিসমূহ শলাকার ন্যায় কেমন কৌশলে মেরুদণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সমস্ত অস্থিখণ্ড–তদ্রূপ আরও বহু অস্থি বিশেষ কৌশলের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা নির্মাণ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্তের বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত। মোটের উপর কথা এই যে, তোমার দেহে দুই শত সাতচল্লিশটি অস্থি নির্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক অস্থিখণ্ড দ্বারা পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য ও কার্য সুকৌশলে সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত এক বিন্দু তরল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ অস্থিসমূহের মধ্যে একটির অভাব হইলে তুমি কোন কাজ করিতে পারিতে না এবং কোন একটি অধিক হইলেও তোমার আরামে ব্যাঘাত ঘটিত।

মাংসপেশী–শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালনশীল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের জোড়ে পাঁচ শত সাতাইশটি মাংসপেশী সৃজন করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি মাংসপেশীর গঠন মাছের আকৃতির মত—মধ্যভাগ মোটা, প্রান্তের দিকে ক্রমশ সূক্ষ্ম। ইহাদের আয়তন ও গঠন বিভিন্ন প্রকার–কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং কতকগুলি বৃহৎ। মাংসপেশীগুলি স্নায়ু-সূত্র ও পর্দা দ্বারা জড়িত ও আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পর্দা যেন ইহাদের আবেষ্টনী। উহাদের মধ্যে চব্বিশটি মাংসপেশী কেবল চক্ষুগোলকের আশেপাশে স্থাপিত আছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের সাহায্যে যেন চক্ষুগোলক ও পলক সর্বদিকে সঞ্চালিত হইতে পারে। অন্যান্য মাংসপেশীসমূহ সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লও। এই সমস্তের বিবরণও বহু বিস্তৃত।

মানবদেহের তিনটি শক্তি কেন্দ্র–তোমার দেহে তিনটি হাওয স্থাপিত আছে। তন্মধ্য হইতে নালী-প্রণালী বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত এবং পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রথম শক্তি কেন্দ্র–মস্তিষ্ক। ইহা হইতে স্নায়ু-সূত্রসমূহ নালী-প্রণালীর ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত দেহে জালের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ ও সঞ্চালন শক্তি মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া স্নায়ুপথে সমস্ত দেহে প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্ক হইতে আর একটি স্নায়ুসূত্র নালার ন্যায় বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে এবং মেরুদণ্ডের প্রতিটি জোড় হইতে ইহার শাখা-প্রশাখা বহির্গত হইয়া দেহময় পরিব্যাপ্ত আছে। এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে, কোন অঙ্গের স্নায়ুজাল যেন মস্তিষ্ক হইতে দূরে না পড়ে এবং মগজ হইতে দূরে পড়িয়া স্নায়ুসূত্রগুলি শুষ্ক হইয়া না যায়।

দ্বিতীয় শক্তি কেন্দ্র– হৃদপিণ্ড। ইহা হইতে রগ ও শিরাসমূহ বাহির হইয়া দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ পরিব্যাপ্তি হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের ভিতর দিয়া দেহপোষক রক্ত সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে।

তৃতীয় শক্তি কেন্দ্র– হৃদয়। এ-স্থান হইতে রগ ও ধমনীসকল বাহির হইয়া সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রাহিয়াছে এবং তৎসমুদয়ের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হইতেছে।

যাহাই হউক তুমি নিজের এক একটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে চিন্তা কর–আল্লাহ্ তা'আলা কি ধরনের এবং কি উদ্দেশ্যে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন।

চক্ষু–চক্ষুকে যেরূপ আকৃতি ও রং দিয়া সূপ্ত অংশে নির্মাণ করিয়াছেন ইহা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। চক্ষুকে ধূলাবালি হইতে রক্ষার জন্য চক্ষুর পাতাকে ঢাকনিস্বরূপ সৃজন করা হইয়াছে এবং এই পাতার প্রান্তভাগে কতকগুলি লোম অতি চমৎকারভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। লোমগুলি সরল ও কৃষ্ণবর্ণ করাতে এক দিকে চক্ষুর শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরপক্ষে দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই লোমগুলি চক্ষে ধূলাবালি পড়িতে দেয় না। উপর হইতে ধূলাবালি পড়িতে গেলে লোমে আটকিয়া যায়। আবার লোমগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজানো হইয়াছে বলিয়া দর্শনেরও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এতদপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার অতীব আশ্চর্য কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য এই যে, চক্ষুর পুতলি পরিমাণে দুই-তিনটি মুসুরদানার সমান হইলেও অসীম আকাশ এবং বিশাল ভূতলের প্রকাণ্ড ছবি ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে। আকাশ এত দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও চক্ষু খুলিবামাত্র ইহার বিশাল ছবি তোমার ক্ষুদ্র চক্ষু-পুতলির মধ্যে আসিয়া পড়ে। চাক্ষুষ দর্শনের বিস্ময়কর ব্যাপার ও দর্পণের মধ্যে দর্শনের বিচিত্র অবস্থা এবং ইহাতে অবাস্তব আকৃতি দর্শনের কারণ বর্ণনা করিতে গেলে বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

কর্ণ–ইহার পর কর্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ। আল্লাহ্ তা'আলা কর্ণ সৃজনপূর্বক ইহাতে এক প্রকার কটু ও বিস্বাদ ময়লা সঞ্চিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন ইহার দুর্গন্ধে কোন কীট কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে। কর্ণের ছিদ্র শামুকের ন্যায় পেঁচালো করাতে শব্দ ইহার মধ্যে প্রতিহত হইয়া গাঢ় হয় এবং উচ্চভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আবার যখন তুমি নিদ্রা যাও তখন পিপীলিকা তোমার অজ্ঞাতসারে কর্ণে প্রবেশ করিতে গেলে ইহার পথ পেঁচালো হওয়াতে তাহাকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, সুতরাং সময়ও অধিক লাগে। ইতিমধ্যে তুমি জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে–এই উদ্দেশ্যে কর্ণের ছিদ্র পেঁচালো করা হইয়াছে।

মুখ, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইবে। যাহাই হউক, উপরে অতি সংক্ষেপে যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহাতে তুমি চিন্তা করিবার পথ পাইবে এবং এইরূপে প্রত্যেক অঙ্গ অবলম্বনে চিন্তা করিতে শিখিলে সেই অঙ্গটি আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা নির্মাণে তাঁহার কি পরিমাণ শিল্পকৌশল, শ্রেষ্ঠত্ব, দয়া,

করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও তুমি ক্রমে ক্রমে অবগত হইবে। তোমার আপাদমস্তক প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান আছে।

মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা– মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা আরও আশ্চর্যজনক। মস্তিষ্কের অন্তর্গত জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং অনুভব শক্তি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার। বক্ষের অভ্যন্তরে রক্তধারা ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কারখানা এবং উদরের কার্যাবলী নিতান্ত চমৎকারজনক। আল্লাহ তা'আলা পাকস্থলীকে ডেকচির ন্যায় করিয়াছেন, জ্বলন্ত চুল্লির উপর স্থাপিত ডেকচির ন্যায় পাকস্থলীতে তেজপ্রভাবে সর্বদা বলক উঠিতেছে। খাদ্যদ্রব্য ইহাতে পড়িলে পরিপাক হইা যায়। এই পরিপক্ক খাদ্যদ্রব্য হৃদপিণ্ডে গিয়া রক্তে পরিণত হয়। এ স্থান হইতে রগ ও শিরাসমূহ সমস্ত অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেয়। পিত্তকোষ রক্তের অন্তর্গত পিত্ত ছাকিয়া ফেলে এবং রক্তের গাদ প্লীহা নামক যন্ত্র চুষিয়া ছাকিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত জলীয় অংশ যকৃৎ নামক যন্ত্র টানিয়া লইয়া মূত্রাধারের দিকে প্রেরণ করে। এইরূপ গর্ভাশয় ও সন্তানোৎপাদক যন্ত্রসমূহও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তৎপর দেহের ভিতর-বাহিরের যন্ত্রাদির শক্তি যথা–দর্শন, শ্রবণ, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি যাহা আল্লাহ্ দয়া করিয়া মানবকে দিয়াছেন তৎসমুদয়ই নিতান্ত বিস্ময়কর।

কোন চিত্রকর একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রাচীরপৃষ্ঠে অঙ্কিত করিলে তুমি তাহার দক্ষতায় বিস্মত হও এবং তাহার অতি প্রশংসা করিয়া থাক। কিন্তু বিশ্বশিল্পী আল্লাহ যে এক বিন্দু পানির পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে এই বিস্ময়কর চিত্র নরদেহ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ না। উহা প্রস্তুত করিবার সময় শিল্পীর কলম বা স্বয়ং শিল্পীকে দেখা যায় না। এইরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর মহত্ত্বে তোমরা বিস্মিত হইতেছ না! সেই মহাশিল্পীর অপ্রতিহত শক্তি, পূর্ণজ্ঞান অনুধাবন করিয়া তোমরা আত্মহারা হইতেছে না! এমন সৃষ্টিকর্তার অনন্ত করুণা ও অসীম ভালবাসা বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছ না!

সন্তান পোষণের সদয় কৌশল–মাতৃগর্ভে তুমি ক্ষুধার্ত হইলে পরম দয়ালু আল্লাহ কেমন সদয় ব্যবস্থায় তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি ও দেহ পোষণ করিয়াছেন, একেবার ভাবিয়া দেখ। সেই সময় মুখ দিয়া তোমার আহার দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তুমি মুখ খোলামাত্র জননীর ঋতু-রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে তোমার মুখে

প্রবেশ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করিত। এই জন্য তিনি নাভী-পথে তোমাকে আহার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে নাভী-পথে আহার দানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কারণ মাতা তখন আপন সন্তানকে পরিমাণমত আহার দিতে পারেন। অতি শৈশবে তোমার শরীর অত্যন্ত কোমল ও দুর্বল ছিল বলিয়া কঠিন খাদ্য তখন আহার পারিপাক করিবার ক্ষমতা তোমার ছিল না; এইজন্য তরল ও লঘু মাতৃদুগ্ধের ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু পূর্ব হইতেই মাতৃ-বক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মাতৃস্তনের বোঁটার আয়তন তোমার মুখের আয়তনের পরিমাণমত বানানো হইয়াছে যেন অধিক পরিমাণে দুগ্ধ তোমার মুখে না পড়ে। জননীর বক্ষস্থলে এক স্বাভাবিক শক্তি বসাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা ধোপার ন্যায় কাজ করে। জননীয় স্তনে লোহিত বর্ণের যে রক্ত আসে তাহাকে ঐ শক্তি ধুইয়া শুভ্র দুগ্ধে পরিণত করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লঘুপাক করিয়া তোমার মুখে দেয়। বাৎসল্যকে আল্লাহ্ তোমার মাতার হৃদয়ে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি ক্ষুধিত হওয়া মাত্র মাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ে দাঁতের প্রয়োজন হয় না, এইজন্য অতি শৈশবে দাঁত সৃজন করা হয় নাই। সেই সময়ে তোমার মুখে দাঁত থাকিলে দাঁতের আঘাতে মাতার স্তন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। যখন শক্ত দ্রব্য খাইবার শক্তি জন্মিল তখন আল্লাহ্ তোমাকে দাঁত দিলেন এবং উহার সাহায্যে তুমি শক্ত দ্রব্য খাইতে সক্ষম হইলে।

যে ব্যক্তি এই সকল শিল্পকার্য ও সৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চিন্তনে হতবুদ্ধি না হয় এবং তাঁহার পূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণে বিস্মিত না হয়, এবং তাঁহার অপার মহিমা ও অনন্ত সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ না হয়, সেইব্যক্তি বাস্তবিকই অন্ধ। এইরূপ আশ্চার্যজনক পদার্থ অবলম্বনে যে ব্যক্তি চিন্তা করে না এবং নিজের দেহেরও খবর রাখে না, বিশেষত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পদার্থ যে বুদ্ধি তাহাও বৃথা নষ্ট করে সে নরাকৃতি পশু, বড় গাফিল। সে এইমাত্র বুঝে যে, ক্ষুধা লাগিলে আহার করিতে হয়, ক্রোধ আসিলে উত্তেজিত হইতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র মারিফাতের উদ্যানে ভ্রমণ হইতে সে পশুর ন্যায়ই বঞ্চিত থাকে।

মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে উপরে যতটুকু বর্ণিত হইল বুদ্ধিমানের জন্য ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহা বলা হইল তাহা তোমার শরীরের

আশ্চর্য পদার্থের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে। তোমার দেহের যে সকল বিস্ময়কর পদার্থের উল্লেখ করা হইল তাহা ক্ষুদ্র মশা হইতে বৃহৎ হস্তী পর্যন্ত সকল প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। ইহার বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর দ্বিতীয় নিদর্শন পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত ও তদভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহ–তুমি যদি নিজ দেহসংক্রান্ত বিস্ময়কর পদার্থের চিন্তা সমাপ্ত করিয়া চিন্তারাজ্যে অধিক অগ্রসর হইতে চাও তবে পৃথিবী অবলম্বনে চিন্তায় প্রবৃত্ত হও।

ভূপৃষ্ঠ– ইহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন কৌশলে তোমার শয্যাস্বরূপ বিছাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত করিয়াছেন যে, তুমি ইহার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে আল্লাহ পাহাড়-পর্বতরূপ পেরেক গাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভূপৃষ্ঠ শক্ত হইয়াছে, নড়াচড়া করে না। কঠিন প্রস্তর হইতে সেই মহাকৌশলী আল্লাহ্ ধীরে ধীরে পানি নির্গত করিতেছেন। এই পানি সমস্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে, কঠিন প্রস্তরের চাপে পানির গতি আবদ্ধ না হইলে পানি একেবারে বাহির হইয়া সমস্ত দুনিয়া ডুবাইয়া দিত অথবা শস্য ও উদ্ভিদের পক্ষে পানি সেচনের উপযোগী সময়ের পূর্বেই একেবারে পানি আসিয়া উহা বিনাশ করিয়া ফেলিত। তৎপর বসন্তকাল সম্বন্ধে চিন্তা কর। দারুন শীতের প্রভাবে মাটি মরিয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। বসন্তের বৃষ্টিপাতে সেই মরা মাটি তৃণ-শস্যে কিরূপ সুন্দর ও সজীব হইয়া উঠে! ভূপৃষ্ঠ সপ্ত বর্ণের সোনালী বস্ত্রের শোভা ধারণ করে। সপ্ত বর্ণ নহে, বরং ভূপৃষ্ঠ তখন সহস্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য–যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাহা অবলম্বনে চিন্তা কর। কোনটিতে ফুল ফুটিতেছে; কোনটিতে আবার কলিকা দুলিতেছে। প্রতিটি ফুল ও কলিকার বর্ণ ও আকৃতি পৃথক পৃথক। একটি অপেক্ষা অপরটি উৎকৃষ্ট। তৎপর নানা প্রকার বৃক্ষ ও ফল লইয়া চিন্তা কর। ইহাদের সৌন্দর্য, আস্বাদ, গন্ধ ও গুণের প্রতি লক্ষ্য কর। আবার আল্লাহ্ এমন সহস্র সহস্র গুল্ম-লতা উৎপন্ন করিতেছেন যাহাদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। এই সমস্ত অজ্ঞাত গুল্ম-লতার মধ্যে তিনি অতি আশ্চর্য গুণ ও উপযোগিতা রাখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি মিষ্ট, কোনটি কটু, কোনটি টক। কোনটির প্রভাব এমন যে, মানুষের রোগ উৎপন্ন করে, অপর পক্ষে কোনটির উপকারিতা এইরূপ যে

রোগ বিদূরিত করে। কোনটি প্রাণ রক্ষা করে, আবার কোনটি প্রাণ সংহারক বিষ। কোনটি পিত্ত বৃদ্ধি করে, কোনটি উহা বিনাশ করে। কোনটি উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি করে, কোনটি শিরা উপশিরা হইতে বায়ু রোগ নির্গত করিয়া দেয়। কোনটি গরম, কোনটি ঠাণ্ডা; কোনটি শুষ্কতা বৃদ্ধি করে, কোনটি আবার আর্দ্রতা আনয়ন করে। কোনটি নিদ্রা বৃদ্ধি করে, কোনটিতে নিদ্রা বিদূরিত হয়! কোন কোন গাছ-গাছড়া মানব-মনের প্রফুল্লতা জন্মায়, কোনটিতে বিমর্ষতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। কোন উদ্ভিদ মানুষের খাদ্য, কোনটি পশুর খাদ্য। আবার কোনটি পক্ষীর আহার। এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, জগতে এইরূপ সহস্র সহস্র উদ্ভিদ রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার বিস্ময়কর ব্যাপার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত সৃজনে পরম কৌশলী আল্লাহ তা'আলার যে অপরিসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া জগতের মহাজ্ঞানী অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের পক্ষে হতবুদ্ধি হওয়াই সমীচীন। এই সকল উদ্ভিদের সংখ্যাও আবার অসীম।

আল্লাহ্‌র অনন্ত গুণাবলীর তৃতীয় নিদর্শন ঃ ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ–তন্মধ্যে কতকগুলি অতি মূল্যবান ও দুর্লভ। আল্লাহ্ ইহাদিগকে পাহাড়-পর্বতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি মানবদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়; যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ফীরোযাহ্, ইয়াকুত প্রভৃতি বহুমূল্য মণি-মাণিক্য। আবার কতকগুলি তৈজসপত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়; যথা–লৌহ, তামা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু। আর কতকগুলি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়; যেমন–লবণ, গন্ধক, নেফ্‌তা, আলকাতরা ইত্যাদি। তন্মধ্যে লবণ খুব সুলভ ও সামান্য পদার্থ। কিন্তু ইহার গুণে সাধ্যদ্রব্য হযম হয়। কোন লোকালয়ে লবণের অভাব ঘটিলে সেই স্থানের খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ হইা যায়, অধিবাসীগণ পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র দান ও দয়া অবলম্বনে চিন্তা কর। তোমার দেহ রক্ষার জন্য খাদ্যের আবশ্যক। এই খাদ্য সুস্বাদু করিতে যে লবণের প্রয়োজন তাহা তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। বৃষ্টির পানি হইতে তিনি লবণ উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভূগর্ভে বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হইয়া লবণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপারও অসংখ্য এবং অগণিত।

আল্লাহ্‌র অনন্ত গুণাবলীর চতুর্থ নিদর্শন ঃ জগতের সকল জীবজন্তু– ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পায়ে চলে, কতকগুলি উড়ে। কতকগুলি দুই পায়ে চলে, কতকগুলি বুকের উপর ভর করিয়া চলে, আবার কতকগুলি বহু পায়ে চলে। তৎপর খেচর প্রাণী ও ভূচর পোকামাকড় প্রভৃতি লইয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখা। এই সকল প্রাণীর আকৃতি বিভিন্ন প্রকারের। একটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকের পক্ষে জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদয়ই আল্লাহ্ দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে জীবন যাপনের কৌশল ও নিয়ম শিখাইয়াছেন। তদনুযায়ী ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে ও নিজ নিজ সন্তান পালন করে এবং বাসা নির্মাণ করিয়া লয়।

পিপীলিকা–পিপীলিকার দিকেই মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর। ইহারা উপযুক্ত সময়ে কেমন দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সহিত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। গমের দানাগুলি গোটা রাখিলে ভিতরে কীট জন্মিয়া বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইবে ভাবিয়া ইহারা দানাগুলি দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখে। ইহারা ধনিয়া বীজ পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখে যে, আস্ত না রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে, তজ্জন্য এইগুল আস্তই রাখিয়া দেয়।

মাকড়সা–মাকড়সার প্রতি একবার লক্ষ্য কর। ইহারা শিকার ধরিবার জাল কিরূপ কৌশলে তৈয়ার করে। যেরূপে জাল বুনিলে মশা-মাছি প্রভৃতি শিকার সহজে ধরা পড়ে তৎপ্রতি ইহারা কেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে! মুখের লালা দিয়া সূতা প্রস্তুত করত দেওয়ালের এক কোণে জালসূত্রের এক প্রান্ত আটকাইয়া অপর কোণে তানা টানিয়া লইয়া যায়। তানা দেওয়া শেষ হইলে বোনা আরম্ভ করে। তানা ও বোনার সূতাগুলি সমান সমান ব্যবধানে স্থাপন করে; ইহাতে জাল দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। জাল বোনা শেষ হইর মাকড়কা একগাছী সূতা মুখে লইয়া দেওয়ালের এক কোণে জালের একটি সূতা ধরিয়া মশা-মাছির প্রতীক্ষায় লটকিয়া থাকে। মশা-মাছি আসিয়া জালে পড়িলে মাকড়সা তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করে ও মুখের সূতা দিয়া শিকারের হাত-পা জড়াইয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে যাহাতে ইহা উড়িয়া পলায়ন করিতে না পারে। যখন বুঝিতে পারে যে শিকার আর উড়িয়া যাইতে পারিবে না তখন ইহাকে রাখিয়া নূতন শিকারের প্রতীক্ষায় থাকে।

ভীমরুল ও মৌমাছি– ভীমরুল ও মৌমাছির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। ইহারা কেমন ছয় কোণবিশিষ্ট কামরা নির্মাণ করে। যদি চতুর্ভুজ কামরা হইত

ইহাদের গোল দেহ তন্মধ্যে স্থাপন করিলে কামরার ভিতরে অনেক স্থান অনর্থক পড়িয়া থাকিত। আবার ইহাদের কামরা যদি গোল হইত তবে একই ছাদের নীচে বহু কামরা সন্নিবেশিত করা হইলে কামরার বাহিরে বহু শূন্য স্থান থাকিয়া যাইত। অঙ্কশাস্ত্রে প্রমাণিত আছে যে, ছয় কোণবিশিষ্ট ক্ষেত্রই আকারে গোলাকার ক্ষেত্রের অধিক নিকটবর্তী। কামরার ভিতরে ও বাহিরে যেন অধিক পরিমাণে শূন্যস্থান না থাকে তজ্জন্য অঙ্কশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ছয় কোণবিশিষ্ট কামরা তৈয়ার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইহারাও তাহাই করে। অতএব ভাবিয়া দেখ, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর আল্লাহ্‌র দয়া কিরূপ। তিনি দয়া করিয়া এই সামান্য প্রাণীকেও অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে গৃহ-নির্মাণের আশ্চর্য কৌশল শিখাইয়া দিয়াছেন।

মশা–মশার খাদ্য রক্ত। ইহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। এবং রক্ত চুষিয়া লইবার জন্য তিনি মশাকে একটি শুঁড় প্রদান করিয়াছেন। মশা এই শুঁড় মানবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া পান করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে দুইটি হালকা পাত্‌লা ডানা দান করিয়াছেন। মানুষ ইহাকে ধরিতে চাহিলে সে বুঝিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়ন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসে। মশাকে আল্লাহ কথা বলিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি প্রদান করিলে ইহা আল্লাহ্‌কে এত অধিক ধন্যবাদ দিত যে, মানুষ ইহাতে চমৎকৃত হইয়া থাকিত। কিন্তু ইহার সমস্ত দেহ হইতে যে অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহা যেন বাকশক্তি ধারণ করিয়া স্বীয় ভাষায় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত রহিয়াছে। অথচ আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থাৎ "আর কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ বুঝিতে পার না।" (সূরা বানী ইস্‌রাঈল, ৫ রুকূ ১৫ পারা।)

বিস্ময়কর সৃষ্টির উপলব্ধি ও বর্ণনা মানবের অসাধ্য–জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই। এমন শক্তি কাহার আছে যে, উহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও উপলব্ধি করত বর্ণনা করিতে পারে? এই যে অসংখ্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ তাহারা কেমনে এমন চমৎকার আকৃতি, নানা রঙ্গের মনোরম মূর্তি এবং সুগঠিত অঙ্গ লাভ করিল! প্রিয় পাঠক, ইহারা কি

নিজেকে নিজে এইরূপ সুন্দর করিয়া বানাইয়াছে? না, তুমি এইরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছ? সুব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র মহিমা কি অসীম! তিনি মানবকে দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা সত্ত্বেও তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন যেন সে দেখিতে না পায়। চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধি বিবেচনা তাহাকে দিয়াও তাহার মনকে তিনি অচেতন করিয়া রাখিতে পারেন। তদ্রূপ অবস্থায় সে চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপ বহু লোক আছে যাহারা প্রকাশ্য চর্মচক্ষে দেখে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষে দর্শন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যে বাক্য শ্রবণের যোগ্য তাহা তাহারা শুনে না। পশুদের ন্যায় তাহাদের কর্ণ-বিবরে আওয়ায ব্যতীত আর কিছুই প্রবেশ করে না। তাহাদের কর্ণে উপদেশ-বাক্য পাখির কলরবের ন্যায় শ্রুত হয়–ইহা হইতে তাহারা কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহা দেখা কর্তব্য ইহা দর্শনে তাহারা অক্ষম হইয়া থাকে। কাগজের উপর অক্ষর দ্বারা যাহা লিপিবদ্ধ হয় তাহা তাহারা পড়িতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বজগতের সর্বত্র এমন কি প্রতিটি রেণুর উপর বিনা-অক্ষরে ও বিনা-আকৃতিতে আল্লাহর মহান কলমে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহারা দেখিতে পারে না।

পিপীলিকার ডিম্ব কি ঘোষণা করে?–পিপীলিকার ডিম্ব একটি বালুকাকণা তুল্য ক্ষুদ্র পদার্থ। একবার ইহার প্রতি মনোযোগ দাও এবং কান লাগাইয়া শুন, ইহা কি বলিতেছে। ইহা পরিষ্কার ভাষায় উচ্চস্বরে বলিতেছে–"হে চিন্তাশূন্য মানব, চিত্রকর প্রাচীরপৃষ্ঠে একটি সুন্দর চিত্র অংকিত করিলে তোমরা সেই চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্য ও দক্ষতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ কর। এস, আমার প্রতি লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ তা'আলার শিল্পনৈপুণ্য ও চিত্রকৌশল দেখিতে পাইবে। আমি একটি ক্ষুদ্র রেণু অপেক্ষা বৃহৎ নহি। আমা হইতে পরিশেষে সেই মহাশিল্পী আল্লাহ্ পিপীলিকা বানাইবেন। চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি আমার অঙ্গসমূহ কিরূপে ভাগ করিবেন–আমা হইতে মন, মস্তিষ্ক, হস্ত-পদ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করিবেন; আমার মস্তক ও মস্তিষ্ক-ভাণ্ডারকে কয়েকটি কুঠরীতে ভাগ করিবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক কুঠরীতে বিভিন্ন শক্তি স্থাপন করিবেন–একটিতে আস্বাদনশক্তি অপরটিতে ঘ্রাণশক্তি এবং অন্যটিকে দর্শনশক্তি স্থাপন করিবেন। আমার মস্তিষ্কের বহির্ভাগে কত সুন্দর দৃশ্যের সৃজন করিবেন এবং উহাতে অমূল্য বস্তু স্থাপন করিবেন। তৎসঙ্গে মস্তকের এক অংশে নাসিকা ও মুখ-বিবর সৃজন করত আহার গিলিবার পথ প্রস্তুত করিবেন এবং আমা হইতে

হস্ত-পদও বাহির করিবেন। আমার উদরে খাদ্য পরিপাকের স্থান রাখিবেন এবং এমন পথও প্রস্তুত করিবেন যদ্বারা খাদ্যের অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রস্তুত করিবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার দেহ নিতান্ত লঘু, দ্রুত গতিশীল ও সক্রিয় হইবে। আমার শরীর তিন ভাগে ভাগ করত সুনিপুণভাবে এক ভাগকে অপর ভাগের সহিত মিলাইয়া দিবেন। চৌকিদারের কোমরে যেমন পেটি বাঁধা থাকে আমার কোমরেও তদ্রূপ পেটি বাঁধিয়া দিবেন এবং আমার শরীরে কৃষ্ণবর্ণের কাবা পরাইয়া দিবেন।

হে মানব, তুমি মনে করিতেছ, বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তু এবং জীবজন্তু তোমার সুবিধা ও পরিচর্যার জন্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু শুনিয়া রাখ, যখন তিনি আমাকে এই ডিম হইতে বাহির করিবেন তখন আমিও তোমাদের ন্যায় ভূতলে চলাফেরা করিব। সেই সময় আমিও দোখিতে পাইব যে, এই পৃথিবী আমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি যেমন সম্পদ ভোগ করিতেছ, আমিও তদ্রূপ নি'আমত ভোগ করিতে থাকিব। আরও দেখিবে যে, জগতের সকলেই আমার খেদমত করিতেছে, এমন কি তোমাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও আমার খেদমতে নিযুক্ত আছে। দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ভূমি কর্ষণ, বীজ-বপন ও পানি-সেচন করিয়া মানব ধান্য, গম প্রভৃতি যাহা উৎপন্ন করে তাহা আমরা সুখে ভোগ করিতে পাইব। মানুষ আমার সুখের জন্যই পরিশ্রম করিয়া যাইবে। তোমরা শস্য কাটিয়া যে স্থানেই লুকাইয়া রাখ না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মত নগণ্য পিপীলিকাকে ইহার সন্ধান দিবেন। আমি মাটির নিচে গর্তে থাকিলেও তোমাদের শস্যের গন্ধ পাইয়া ইহার অনুসরণে তোমাদের শস্য-ভাণ্ডারে গিয়া উপস্থিত হইব। কঠোর পরিশ্রমে তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাতে হয়ত তোমাদের সারা বৎসরের আহারের সংস্থান হয় না। কিন্তু আমি তোমার শস্য-ভাণ্ডার হইতে এত খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইব যে, ইহাতে আমার এক বৎসরের, এমন কি তদপেক্ষা অধিক সময়ের আহার চলিতে পারে। সেই খাদ্যদ্রব্য অতি সাবধানে এমন নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিব যে, কিছু মাত্রই অপচয় হইতে পারিবে না। আমাদের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ময়দানে আনিলে আল্লাহ্ আমাদিগকে বৃষ্টিপাতের সংবাদ ইলহাম দ্বারা পূর্বেই জানাইয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং বৃষ্টিপাতের পূর্বেই আমরা সেই দ্রব্য ময়দান হইতে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিব যাহাতে বৃষ্টিপাত ইহার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। হে মানব, তোমরা যদি ময়দানে শস্য-গোলা দিয়া রাখ

এমন সময় যদি শিলা ও বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় তবে তোমাদের সঞ্চিত খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কেননা তোমরা ইহার খবর পূর্বে পাওনা।

অতএব করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা কিরূপে শোধ করিব! তিনি যে আমার ন্যায় এত তুচ্ছ রেণু হইতে এমন চালাক ও কর্মদক্ষ প্রাণী সৃষ্টি করিবেন এবং তোমাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জীবকে আমাদের ন্যায় তুচ্ছপ্রাণীর খেদমতগার বানাইয়া দিবেন—তোমরা আমাদের খাদ্য জোগাইবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, শস্য বপন করিবে এবং শস্য কাটিবে; এইরূপে কত দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিবে। অপর দিকে আমরা মজা করিয়া আরামে বসিয়া খাইব। এমতাবস্থায় আমরা দয়াময় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি!

মোটের উপর কথা এই যে, বিশ্বের ছোট-বড় প্রাণীর মধ্যে এমন কেহই নাই, যে স্বীয় ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করিতেছে না। সদ্যজাত প্রতিটি পক্ষীশাবক, প্রতিটি রেণু, এমন কি প্রতিটি লতাপাতা হইতেও আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসাবাদ সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু মানব সে তাস্‌বীহ্‌র দিকে কান দিতেছে না–অন্যমনস্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ –

অর্থাৎ "তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই শ্রবণ হইতে নিবারিত রাখা হইয়াছে।" (সূরা শু'আরা, ১১ রুকূ, ১৯ পারা।) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ –

অর্থাৎ "আর তাঁহার প্রশংসার সহিত তাস্‌বীহ পড়ে না এমন কোন বস্তু নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদের তাস্‌বীহ বুঝ না।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ৫ রুকূ, ১৫ পারা।) এই বিশ্বে বিস্ময়কর বস্তু ও জীবজন্তুর অন্ত নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আল্লাহর অনন্ত গুণাবলীর পঞ্চম নির্দশন ঃ বিশাল সমুদ্র যাহা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে– প্রত্যেক সাগর-উপসাগর, নদী-উপনদী এই মহাসমুদ্রের পৃথক পৃথক খণ্ড। এই মহাসমুদ্র সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে বেষ্টন করিয়া আছে।

বাস্তবপক্ষে স্থলভাগ সমুদ্রের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি আস্তাবল যেরূপ সমুদ্রের মধ্যে স্থলভাগও তদ্রূপ। প্রিয় পাঠক, তুমি স্থলভাগের পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার ধারা শিক্ষা করিলে, এখন জলভাগের বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে প্রদত্ত হও। জলভাগ যেমন স্থলভাগ অপেক্ষ বৃহৎ, তদন্তর্গত বিস্ময়কর ব্যাপারও তদ্রূপ অধিক। স্থলভাগে যেমন জীবজন্তু আছে, জলভাগেও তদ্রূপ জীবজন্তু আছে। কিন্তু জলভাগে এমন বহু জীবজন্তু আছে যাহা স্থলভাগে নাই। আবার এই সকল প্রাণীর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতি পৃথক পৃথক।

জলজ প্রাণী– কোন জলজপ্রাণী এত ছোট যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কোনটি এত বড় যে, জাহাজ ইহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িলে লোকে মনে করে, উহা ভূপৃষ্ঠে লাগিয়া গিয়াছে। স্থলভাগ ভ্রমে লোকে এই প্রাণীর পৃষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে অগ্নির তেজে উহার পৃষ্ঠে কিছু আছে বলিয়া সে টের পায় এবং নড়িয়া উঠে। তখন লোকে বুঝিতে পারে যে, উহা ভূপৃষ্ঠ নহে–জলজ প্রাণীর পৃষ্ঠ। সমুদ্রের ও তদন্তর্গত বস্তুর বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বহু লোকে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহার সমাবেশ হইবে কিভাবে?

ঝিনুক–আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রগর্ভে এক প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার আবরণকে ঝিনুক বলে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে বৃষ্টিপাতের সময় মেঘের বারিবিন্দু উদরস্থ করিয়া লইতে ইলহাম করিয়াছেন। বৃষ্টিপাতের সময় ইহারা সমুদ্রের লবণাক্ত পানির তল হইতে ভাসিয়া উঠে এবং মেঘের দিকে মুখ খুলিয়া থাকে। বৃষ্টির মিষ্ট পানির বিন্দু উদরস্থ হইলে মুখ মদ্রিত করত ইহারা আবার সমুদ্রতলে চলিয়া যায়। এই বৃষ্টির পানি ইহাদের উদরে মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দুর ন্যায় সযত্নে রক্ষিত হয়। বহুকাল পর এই বৃষ্টি বিন্দুগুলি মুক্তারূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্র কোনটি বৃহৎ। এই সকল মুক্তা দ্বারা মানব শোভা বৃদ্ধির জন্য হার ও অন্যান্য ভূষণ প্রস্তুত করে।

প্রবাল ও আম্বর–সমুদ্রগর্ভে আল্লাহ্ লোহিত প্রস্তরবৎ এক প্রকার গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার আকার অবিকল স্থলভাগের বৃক্ষের ন্যায়। ইহা হইতে বহুমূল্য রত্ন উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষকে মরজান বা প্রবাল বলে। প্রবাল বৃক্ষের ফেনা হইতে আবার সমুদ্রতীরে এক প্রকার পদার্থ তৈয়ার হয়। ইহাকে আম্বর বলে। প্রাণীদেহের বাহিরে ও সমুদ্রে এইরূপ বিস্ময়কর বস্তু বহু আছে।

জলপথে যাতায়াত–পানির উপর দিয়া জাহাজ ও নৌকা চলাচল অবলম্বনেও চিন্তা করা উচিত। পানিতে না ডুবে এমনভাবে নৌকা বানাইতে মানবকে আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়াছেন এবং মাঝিকে অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু চিনাইয়া দিয়াছেন, নক্ষত্ররাজি সৃজনের মধ্যে আল্লাহ্র ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেখানে একমাত্র পানি ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না, তথায় এই নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকগণ পথ নির্ণয় করে। ইহা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।

পানির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য– পানির প্রকার, তরলতা ও স্বচ্ছলতা অবলম্বনে চিন্তা কর। সকল বস্তুর সহিতই ইহার যোগাযোগ আছে। পানিকে আল্লাহ্ সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি সকল প্রাণীর জীবনস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। আবার ভাবিয়া দেখ, প্রবল পিপাসার সময় তুমি যখন এক ঢোক পানির জন্য লালায়িত হও তখন যদি পানির অভাব হয় তবে তুমি ততটুকু পানির বিনিময়ে তোমার যথাসর্বস্ব ধন দিতে প্রস্তুত হও। আবার সেই পানি পান করিয়া যদি ইহা মূত্রাধারে আটকাইয়া যায়, প্রস্রাবের পথে বাহির না হয়, তখনও তুমি সেই মূত্র বাহির করিয়া ইহার যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার নিমিত্ত তোমার যথাসর্বস্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত হও। মোটের উপর কথা এই যে, পানি ও সমুদ্রের বিস্ময়কর ব্যাপারের সীমা নাই।

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ বায়ু ও বায়ু মণ্ডলের অন্তর্গত বস্তুসমূহ–বায়ুমণ্ডল তরঙ্গায়িত সমুদ্রসদৃশ। বায়ু প্রবাহই বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ।

বায়ু–ইহা এত সূক্ষ্ম ও লঘু যে, দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এমন স্বচ্ছ যে ইহার ভিতর দিয়া দেখিতে বাধা জন্মায় না। এই বায়ু সর্বক্ষণের জন্য তোমার প্রাণের খাদ্য। দিবসের মধ্যে একবার পানাহার করিলেই চলে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও উদরে বায়ু প্রবেশ না করিলে এবং শ্বাস রুদ্ধ থাকিলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অথচ এই কথা তুমি চিন্তা করিতেছ না। বায়ুর অপর এক বিশেষত্ব এই য, ইহার প্রভাবে নৌকা পানির উপর ভাসিতে থাকে এবং নৌকা ডুবে না। বাতাসের গুণ ও উপকারিতার বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত গগনমণ্ডলে লক্ষ্য করিবার পূর্বে একবার বাতাসের কথা চিন্তা কর। দেখ, এই বাতাস হইতেই আল্লাহ তা'আলা মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, বরফ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘন মেঘের বিষয় চিন্তা কর–ইহা অদৃশ্য বাতাসে অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতেছে। সমুদ্র,

নদী ইত্যাদি জলাশয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় বায়ু উহা হইতে পানি বহন করিয়া আনিয়া বা পাহাড়-পর্বত হইতে তেজের প্রভাবে বাষ্প উত্তোলন করিয়া এই মেঘ উৎপন্ন করে; অথবা বায়ুর উপাদানস্থ পাদর্থ হইতে মেঘ প্রস্তুত হয়। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, ঝরণা প্রভৃতি জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত দেশে এই মেঘ বায়ুপ্রবাহে চালিত হয় এবং তথায় বিন্দু বিন্দু আকারে ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

বৃষ্টিবিন্দু–বৃষ্টিবিন্দু সোজাভাবে উপর হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। যে বিন্দুকে আল্লাহ্ যে স্থানে নিক্ষেপ করিবার বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঠিক সেই স্থানে সেই বিন্দু আসিয়া পড়ে। যে কীট পিপাসায় কাতর আছে, ইহার পিপাসা নিবারণের জন্য যে বৃষ্টি-বিন্দু নির্ধারিত আছে, ঠিক তাহাই সেই কীটের নিকট বর্ষিত হয়। যে উদ্ভিদ পানির অভাবে শুকাইতেছিল এইরূপ বিধানে তাহার নির্ধারিত বৃষ্টিবিন্দু পাইয়া সজীবন হইয়া উঠে। যে শস্যদানা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে বারিবিন্দু নির্দিষ্ট ছিল ঠিক সেই বিন্দুগুলি ইহার উপর পতিত হয়। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় পানির অভাবে যে ফলটি শুষ্ক হইতেছিল, ঠিক সেই বৃক্ষের মূলে নির্ধারিত বৃষ্টিবিন্দু ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই পানির যে অংশে সেই ফলটিকে তাজা করিবার বিধান হইয়াছিল সেই পানিটুকু বৃক্ষমূলের অভ্যন্তরস্থ কেশ হইতে সূক্ষ্ম শিরাপথে ঠিক সেই শুষ্কপ্রায় ফলের মধ্যে প্রবেশ করত ইহাকে সরল করিয়া তোলে। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এইরূপ অসীম করুণার প্রতি উদাসীন হইয়া চিন্তাশূন্য অবস্থায় সেই ফল আহার করিয়া থাক। বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দুর উপর আল্লাহ্ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, এই বিন্দুটি অমুক স্থানে পড়িবে এবং অমুকের জীবিকারূপে পরিণত হইবে। বৃষ্টিবিন্দু গণনা করিবার জন্য যদি বিশ্বের সমস্ত লোক একত্র হয় তথাপি গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। বৃষ্টি যদি একবারেই বর্ষিত হইত হবে উদ্ভিদের ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত পানি আবশ্যক মত পাওয়া যাইত না।

বরফ– উদ্ভিদ জাতির জন্য ক্রমে ক্রমে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা শীত ঋতু সৃষ্টি করিয়াছেন। শীতের প্রভাবে পানি বরফে পরিণত হয় এবং ধুনিত তুলার ন্যায় রেণু-রেণুরূপে পতিত হয়। আল্লাহ্ পাহাড়-পর্বতকে বরফের আলয় বানাইয়া রাখিয়াছেন। পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু অধিক শীতল বলিয়া পর্বতগাত্রে বরফ জমিয়া থাকে এবং শীঘ্র গলিয়া যায় না। বসন্ত আগমনে উষ্ণতা বৃষ্টি পাইলে ক্রমে ক্রমে বরফ গলিতে আরম্ভ করে। তখন

ঝরণা ও নদী দিয়া আবশ্যকমত পানি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে সমস্ত গ্রীষ্মকালে শস্যক্ষেত্রসমূহে অল্প অল্প পানি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, সর্বদা বৃষ্টিপাত হইলে লোকের কষ্ট হইত। অপর দিকে একইবারে সমস্ত পানি বর্ষাইয়া দিয়া বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখিলে, উদ্ভিদরাজি সারা বৎসর শুষ্ক হইয়া থাকিত। এখন ভাবিয়া দেখ, বরফ সৃষ্টির মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার কত দয়া নিহিত রহিয়াছে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্র দয়া যে কেবল বরফ সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহাই নহে। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্র অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বরং ভূমণ্ডল এবং গগনমণ্ডলের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি বস্তু তিনি বিচারপূর্বক এবং কৌশলপূর্ণ সদয়ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ـ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ "গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার কোন পদার্থ নিরর্থক ক্রীড়াচ্ছলে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত বস্তুই সত্য সহকারে, যেখাবে সৃজন করা উচিত ছিল ঠিক সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকে ইহা বুঝে না।" (সূরা দুখান, ২য় রুকূ, ২৫ পারা।)

আল্লাহ্র অনন্ত গুণাবলীর সপ্তম নির্দশন ঃ গগনরাজ্য গ্রহ-নক্ষত্র এবং তন্মধ্যস্থ বিস্ময়কর ব্যাপারসমূহ–গগনরাজ্যের বিস্ময়সমূহের তুলনায় ভূমণ্ডলের ব্যাপার অতি সামান্য। আকাশ ও নক্ষত্ররাজি অবলম্বনে চিন্তা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে আদেশ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ -

অর্থাৎ "আর আকাশকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করিয়াছি এবং তাহারা ইহার নির্দশনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" (সূরা আম্বিয়া, ৩ রুকূ, ১৭ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ "অবশ্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বড়! কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না।" (সূরা মুমিন, ৬ রুকূ, ২৪ পারা।) গগনরাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আদেশ করিয়াছেন; চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আকাশের নীলিমা ও নক্ষত্রের শুভ্রতা দেখিতে বলেন নাই। কারণ, তদ্রূপ দর্শন পশুগণও করিয়া থাকে।

চিন্তার বিষয়বস্তুর ক্রমোন্নতি– তোমার শরীর সম্বন্ধীয় বিস্ময়কর ব্যাপার তোমার যত নিকটবর্তী, গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তোমার তত নিকটবর্তী নহে। আবার গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আশ্চর্য ঘটনার সহিত তোমার শরীর সম্বন্ধীয় আশ্চর্য ঘটনা তুলনা করিলে একটি রেণুতুল্যও হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তুমি যখন তোমার শরীর সম্বন্ধীর বিস্ময়কর ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ জানিতে পার নাই, তখন অসীম গগনরাজ্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনাসমূহ কিরূপে জানিতে পারিবে? বরং তোমাকে উন্নতির পথে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বপ্রথমে তোমার নিজের সম্বন্ধে অবগত হও এবং তৎপর পৃথিবী, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও সমস্ত খনিজ পদার্থ অবলম্বনে চিন্তা কর। ইহার পর বায়ু, মেঘ ও ইহাদের বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে অনুধাবন কর। তৎপর আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির অদ্ভুত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য কর। অবশেষে কুরসী আরশ লইয়া চিন্তা কর। তাহার পর জড়জগত পরিত্যাগ করত আধ্যাত্মিক জগতের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ফিরিশ্‌তা ও শয়তান সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা কর। ইহার পর ফিরিশ্‌তাগণের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের বিভিন্ন মকাম চিনিয়া লও।

গ্রহ-নক্ষত্র অবলম্বনে চিন্তাধারা–গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও ঘূর্ণনের অবস্থা অবগত হও। ইহাদের উদয় ও অস্তস্থল সম্বন্ধে অনুধাবন কর এবং ইহারা কি পদার্থ ও কেন সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে চিন্তা কর। অগণিত নক্ষত্রের সংখ্যা সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখ। বর্ণে ইহারা পৃথক পৃথক–কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটির রং পারদ-ধাতুর ন্যায়। আকৃতিতেই কোনটি ক্ষুদ্র, কোনটি বৃহৎ। দলবদ্ধরূপে ইহাদিগকে চিন্তা করিলে প্রতিটি দলের আকৃতি পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়–কোন দল ছাগলের আকার, কোন দল গরুর ন্যায়, কোন দল বিচ্ছুর

মত দেখায়। এইরূপে কল্পনা করিলে পৃথিবীতে যত প্রকার বস্তু আছে তৎসমুদয়ের মূর্তি আকাশের তারা দ্বারা অঙ্কিত আছে বলিয়া মনে করা চলে। ইহার পর তারকারাজির গতি সম্বন্ধে চিন্তা কর কোনটি এক মাসে সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে, কোনটি এক বৎসরে, কোনটি বার বৎসরে, আবার কোনটি ত্রিশ বৎসরে আকাশপথ পরিভ্রমণ করে। অধিকাংশ তারা এইরূপ ধীর যে, গগনমণ্ডল যদি চিরস্থায়ী থাকিত এবং প্রলয় না হইত তবে ইহারা ছয়ত্রিশ হাজার বৎসরে সমস্ত আকাশপথ অতিক্রম করিত। গগনমণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা নাই।

প্রিয় পাঠক, তোমরা যখন পৃথিবীর বিস্ময়কর ব্যাপারের কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছ, তখন এই কথাও বুঝিয়া লও যে, পদার্থ যত দূরে থাকে তাহার আকারও তত ক্ষুদ্র দেখা যায়। পৃথিবীর আকার এত বড় যে, কেহ ইহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না। সূর্য পৃথিবীর একশত ষাইট গুণ বৃহৎ। পৃথিবী হইতে এত বড় প্রকাণ্ড সূর্য কতদূর ব্যবধানে থাকায় উহাকে এত ক্ষুদ্র দেখা যাইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখ। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে সূর্য কিরূপ দ্রুতগতিতে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের পরিধি ভূচক্রবাল অতিক্রম করে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য পৃথিবীর দূরত্বের একশত ষাইট গুণ পথ আকাশমার্গের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এইজন্যই একদা যখন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "সূর্য কি ঢলিয়াছে?" তখন তিনি উত্তরে বলিলেন– لَا نَعَمْ "না- হাঁ" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) আবার জিজ্ঞসা করিলেন–"ইহার অর্থ কি?" হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–"না–হাঁ" বলিবার সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া গেল।"

কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষা শত গুণ বৃহৎ; কিন্তু দূরত্বের কারণে এত ক্ষুদ্র দেখা যায়। এখন ভাবিয়া দেখ, এক একটি তারা যখন এত বড় তখন আকাশ কত বড়। এত বড় আকাশের ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষে অতি সহজে সমাবেশ হয়। ইহা হইতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অনন্ত ক্ষমতা ও অসীম শ্রেষ্ঠত্বের কিছু পরিচয় পাইতে পার। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে এক একটি হেকমত নিহিত রহিয়াছে–ইহাদের গতিস্থিতি, প্রত্যাবর্তন, অবস্থান এবং উদয়-অস্তের মধ্যে পৃথক পৃথক হেকমত নিহিত আছে। তন্মধ্যে সূর্যের হেকমতই সর্বপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। পরম কৌশলী আল্লাহ্ সূর্যের পথটি রাশিচক্রের মধ্যে

এমনভাবে সুবিন্যাস্ত করিয়াছেন যে, এক ঋতুতে সূর্য মস্তকের উপর মধ্য গগন দিয়া চলিয়া যায় এবং অন্য ঋতুতে মাথার উপর দিয়া না গিয়া দূর দিয়া চলে। এই কারণেই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে, শীত-গ্রীষ্ম ঋতুভেদ হয়; কখনও আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকে। একই কারণ দিবারাত্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে।

মানব জ্ঞানের স্বল্পতা–আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া আমাদিগকে এই অল্পকাল বয়সের মধ্যে যত প্রকার জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে গেলে বহু বৎসর সময় লাগিবে। কিন্তু আমাদের এই সকল জ্ঞান আম্বিয়া এবং আউলিয়াগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত কম। আবার সৃষ্টি বিষয় সম্বন্ধে আউলিয়াগণের জ্ঞান নবীগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অল্প। অপরপক্ষে নবীগণের জ্ঞান প্রধান প্রধান ফিরিশ্‌তাগণের তুলনায় অত্যন্ত কম। আবার এই সমস্ত জ্ঞান একত্র করিয়া আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে এই জ্ঞান সমষ্টিকে জ্ঞান বলাই শোভা পায় না। সুব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহর শান কত ঊর্ধ্বে! মানবকে এত অধিক জ্ঞান দান করা সত্ত্বেও তিনি তাহার উপর অজ্ঞানতার ছাপ মারিয়া দিয়াছেন। তিন বলেন ঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً –

"আর তোমাদিগকে অল্প ব্যতীত জ্ঞান দেয়া হয় নাই।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ১০ রুকূ, ১৫ পারা।)

বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র গৃহ–চিন্তার ধারা বুঝাইবার জন্য এই পর্যন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহা নমুনামাত্র। এই ধরনের চিন্তা করিতে থাকিলে নিজের গাফ্‌লত (উদাসীনতা) বুঝিতে পারিবে। তুমি কোন ধনাঢ্য লোকের মনোরম সৌধ ও নানারূপ চিত্রবিচিত্র বালাখানা দেখিলে ইহার শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হও এবং বহু দিন পর্যন্ত ইহার প্রশংসা করিতে থাক। কিন্তু তোমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় গৃহে অবস্থান করিতেছ অথচ ইহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপূণ্য দর্শনে মোটেই মুগ্ধ হইতেছে না! এই বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র গৃহ। ভূতল ইহার বিছানা এবং আকাশ ইহার ছাদ। বিনা-স্তম্ভে এত বড় ছাদ স্থির রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাহাড়-পর্বত এই গৃহের ধনভাণ্ডার এবং সমুদ্র ইহার রত্নাগার। জীবজন্তু ও উদ্ভিদ ইহার গৃহসামগ্রী। চন্দ্র এই গৃহের প্রদীপ, সূর্য মশাল, তারকারাজি ঝাড়লণ্ঠন এবং ফেরেশ্‌তাগণ ইহার মশালধার।

কিন্তু তুমি এই রাজপ্রাসাদারের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একেবারে অচেতন। কারণ এই রাজপ্রাসাদ অতি বড়; কিন্তু তোমার চক্ষু নিতান্ত ছোট। এই ক্ষুদ্র চক্ষে এত বড় রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইতেছ না। তুমি এমন পিপীলিকাসদৃশ যে রাজপ্রসাদে কোন একটি ছিদ্র করিয়া ইহাতে বাস কর। সে নিজের বাসগৃহ, আহার এবং বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের খবরও রাখে না। সে রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য, দাসদাসীর প্রাচুর্য, রাজসিংহাসনের প্রতাপ এবং স্বয়ং সম্রাটেরও কোন সংবাদ রাখে না।

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মানবের ক্ষমতা–তুমি যদি উপরিউক্ত পিপীলিকার ন্যায় জীবন যাপন করিতে চাও তবে যেমনভাবে আছ তেমনই থাক। কিন্তু তোমাকে আল্লাহ্‌র মারিফাতরূপ উদ্যানে অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের পন্থা দেখানো হইল। তুমি একবার বাহিরে আসিয়া নয়ন খোল, আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্য তোমার নয়নগোচর হইবে এবং তোমাকে অচেতন ও হতভম্ব হইয়া পড়িতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা)

আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বহু মকাম আছে। তন্মধ্যে তাওয়াক্কুল একটি অতি উন্নত মকাম। কিন্তু ইহার জ্ঞান নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য এবং তদনুযায়ী কাজ করাও অত্যন্ত দুষ্কর। তাওয়াক্কুল অনুযায়ী কাজ করা নিতান্ত দুষ্কর হওয়ার কারণ এই– (১) যদি কোন ব্যক্তি মানুষের কার্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের দখল আছে বলিয়া মনে করে তবে তাহাকে তাওহীদে প্রকৃত বিশ্বাসী বলা যায় না। (২) আবার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও মানবীয় কার্য এতদুভয়ের মধ্য হইতে উপকরণ বা মধ্যবর্তী কারণসমূহ বাদ দিলে শরীয়তের প্রতি নিন্দাবাদ করা হয়। আর (৩) মানবীয় কার্যাবলীর প্রকাশ্য কারণসমূহের কোন কারণ বাদ দিলে বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অপর দিকে (৪) প্রকাশ্য কারণসমূহের কোন একটিকে প্রধান বিবেচনা করিয়া তৎপ্রতি ভরসা করিলে খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহা যুক্তি, শরীয়ত এবং তাওহীদ-সঙ্গত হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সকলে উহা বুঝিতে পারে না। এইজন্য প্রথমে তাওয়াক্কুলের ফযীলত বর্ণনা করিব। তৎপর ইহার প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরিশেষে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির মনের যে অবস্থা ঘটে এবং যেরূপ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা হয়, তৎসমুদয় বর্ণনা করিব।

তাওয়াক্কুলের ফযীলত–আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই তাওয়াক্কুল করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং ইহাকে ঈমানের শর্তরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ –

অর্থাৎ "তোমারা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর।" (সূরা মায়িদা, ৪ রুকূ, ৬ পারা।) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ –

অর্থাৎ "যাহারা তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ১৭ রুকূ ৪ পারা।) আল্লাহ্ আর বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ –

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌র তাহার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা তালাক, ১ রুকূ, ২৮ পারা।) তিনি আবার বলেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?" (সূরা যুমর, ৪ রুকূ, ২৪ পারা।) তাওয়াক্কুলের ফযীলত সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন শরীফে এবংবিধ আরও বহু আয়াত আছে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমাকে আমার সকল উম্মত দেখানো হইল। আমি আমার উম্মতে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমি পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম। আমার উম্মতের আধিক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত ও প্রীত হইলাম। আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–'আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি?" আমি নিবেদন করিলাম–'হাঁ সন্তুষ্ট হইয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন–'তন্মধ্যে সত্তর হাযার লোক বিনা-হিসাবে বেহেশতে যাইবে।" ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ (রা) হযরত (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–"যাহারা বিনা-হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবেন, তাঁহারা কে?" হযরত (সা) বলিলেন–"যাহারা মন্ত্রতন্ত্রের উপর নির্ভর করে না (রোগমুক্তির জন্য লোহা পোড়া দিয়া দাগ দেয় না এবং শুভাশুভ লগ্ন দেখিয়া কাজ করে না), বরং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর ভরসা করে না।" ইহা শুনিয়া হযরত ওকাশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে এই সত্তর হাযারের অন্তর্ভুক্ত করেন।" হযরত (সা) প্রার্থনা করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্ এই ব্যক্তিকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" তৎপর অপর একজন সাহাবী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জন্য তদ্রূপ দু'আ করিতে হযরত (সা)-কে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন–"এই ক্ষেত্রে ওকাশা (রা) তোমার পূর্বে কৃতকার্য হইয়াছে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র উপর যেরূপ তাওয়াক্কুল করা উচিত তোমরা যদি তদ্রূপ তাওয়াক্কুল কর আল্লাহ

তোমাদিগকে এমনভাবে রুযী দান করিবেন যেমন তিনি পক্ষীদিগকে দিয়া থাকেন। পক্ষীগণ প্রাতে ক্ষুধার্থ অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে সন্ধ্যাবেলায় তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।" তিনি বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহার সমস্ত কাজ সমাধা করিয়া থাকেন এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দান করেন যাহা পূর্বে তাহার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার আশ্রয় লয়, আল্লাহ্‌ও তাহাকে দুনিয়ার নিকট সোপর্দ করিয়া দেন।"

কাফিরগণ যখন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে চড়কে বসাইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার পক্ষে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য-নির্বাহক।" চড়ক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি যখন শূন্য হইতে পড়িতেছিলেন তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কোন সাহায্য চাহেন কি?" তিনি উত্তর দিলেন–"তোমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই।" হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম পূর্বেই বলিয়াছেন حَسْبِيَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট সহায়। এই উক্তির উপর দৃঢ়পদ থাকিবার জন্যই তিনি হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম অযাচিতভাবে যে সাহায্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। এই কারণেই আল্লাহ তাঁহাকে অঙ্গীকার রক্ষাকারী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলেন–

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى –

অর্থাৎ "ইবরাহীম সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন।" হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর ওহী নাযিল হইয়াছিলঃ "হে দাঊদ, যে ব্যক্তি সমস্ত দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সমগ্র ভূতল ও গগনমণ্ডল তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিলেও আমি তাহাকে সকলের প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করি এবং তাহার সকল বিপদ দূর করিয়া দেই।"

হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবায়র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হস্তে একদা বিচ্ছু দংশন করিল। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শপথ দিয়া হস্তখানি ঝাড়িবার জন্য মন্ত্রপাঠকের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে আদেশ করিলেন। তিনি ইহাতে বাধ্য হইয়া যে-হস্তখানি

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিল, বিচ্ছু দংশন করে নাই, সেই হস্তখানি ওঝার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন–"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন–'যে-ব্যক্তি মন্ত্র ও উত্তপ্ত লৌহের দাগের উপর ভরসা করে, সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী নহে।" হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (রা) এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আপনি জীবিকা কোথা হইতে পাইয়া থাকেন?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন–'যিনি আমাকে জীবিকা দান করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। কারণ, কোথা ইহতে তিনি আমাকে জীবিকা দান করেন তাহা আমি কিছুই জানি না।" এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকেন; আহার চলে কিরূপে?" তিনি দাঁতের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন–"যিনি এই পেষণ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি শস্য-দানাও পাঠাইয়া থাকেন।" "হযরত হরম ইব্‌নে হায়্যান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হযরত উয়াইস করনী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"কোন্ দেশে বাস করিব?" তিনি বলিলেন–"শ্যাম দেশে।" হযরত হরম (র) বলিলেন–"তথায় জীবিকা মিলিবে কি উপায়ে?" হযরত উয়াইস করনী (রা) বলিলেন ঃ

اُفٌّ لِّهٰذِهِ الْقُلُوْبِ قَدْ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ –

অর্থাৎ "যে মনে সন্দেহ প্রবল এবং কোন উপদেশে কোন উপকার হয় না তাহার জন্য আক্ষেপ!"

তাওয়াক্কুলের ভিত্তিরূপে তাওহীদের হাকীকত– মনের একটি উন্নত অবস্থার নাম তাওয়াক্কুল এবং ঈমানের ফলস্বরূপ এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে দুইটি শাখার উপর ঈশান আনয়ন করাকেই তাওয়াক্কুল বলে, যথা–(১) তাওহীদ এবং (২) আল্লাহ্‌র অসীম করুণা ও দয়া। তাওহীদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের চরম সীমা এবং ইহার সম্যক বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এ-স্থলে তাওয়াক্কুলের ভিত্তিরূপে তাওহীদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইবে।

তাওহীদের শ্রেণীবিভাগ–তাওহীদের চারিটি শ্রেণী আছে। আবার তাওহীদের একটি মগজ ও একটি মগজের মগজ এবং একটি ছাল ও একটি ছালের ছাল রহিয়াছে। সুতরাং উহার দুইটি মগজ ও দুইটি ছাল হইল। উহা কাঁচা আখ্‌রোট সদৃশ্য; ইহার দুইটি ছাল, একটি প্রকাশ্য মগজ (সার ভাগ) এবং ইহার তৈলই মগজের মগজ।

প্রথম শ্রেণীর তাওহীদ–لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করা। কিন্তু ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা। একমাত্র মুনাফিকগণই এইরূপ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওহীদ–সর্বসাধারণ লোকের ন্যায়–لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই) কলেমাতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অথবা যুক্তি অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির ন্যায় এক প্রকার যুক্তিপ্রমাণে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদ–প্রত্যক্ষ দর্শনে উপলব্ধি করা। যাঁহারা এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন-ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকল বস্তুর মূলে একমাত্র আল্লাহকে দেখিতে পান এবং এক আল্লাহ্‌কেই সকল কার্যের কর্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা দেখিতে পান না। এই শ্রেণীর লোকের তাওহীদ জ্ঞান এক প্রকার নূর। ইহা হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং এই নূরের প্রভাবে তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন-ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস-জ্ঞান সর্বসাধারণ লোকের বিশ্বাস-জ্ঞান ও যুক্তিবাদীদের বিশ্বাস-জ্ঞানের অনুরূপ নহে। শেষোক্ত দুই রকম লোকের বিশ্বাস-জ্ঞান, অন্ধ-অনুকরণ বা যুক্তি-প্রমাণ প্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে এক-প্রকার গ্রন্থিস্বরূপ লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়, সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং যুক্তি-প্রমাণের সকল শর্তাদি বিদূরিত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদ-বিশ্বাসীদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি অপরের মুখে শুনিল যে, অমুক ব্যক্তি গৃহের ভিতর আছে এবং ইহা সে বিশ্বাস করিয়া লইল। এই বিশ্বাস সাধারণ লোকের ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ হইল। কারণ সাধারণ লোকে তাহাদের পিতামাতার মুখে শ্রবণ করিয়াই বিশ্বাস স্থাপন করে। আর একজন লোক সেই ব্যক্তির গৃহদ্বারে তাহার বাহন অশ্ব ও ভৃত্যকে দেখিতে পাইল এবং এই প্রমাণ পাইয়া সে বিশ্বাস করিয়া লইল যে, ঐ ব্যক্তি গৃহের অভ্যন্তরে আছে। এই বিশ্বাস যুক্তিবাদী তার্কিকগণের বিশ্বাসের অনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি সেই ব্যক্তির গৃহে প্রবেশপূর্বক স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া লইল। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী আরিফগণের বিশ্বাসের অনুরূপ, কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লইল। এই প্রকার লোকের তাওহীদ-জ্ঞান অতীব উন্নত। কিন্তু আরিফ এই শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া

সৃষ্ট পদার্থও দেখিতে পান এবং সৃষ্টিকর্তাকেও দেখিতে পান। এইজন্য এই শ্রেণীর তাওহীদে বহুত্বেরও অধিকার আছে। আরিফ যতক্ষণ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট পদার্থ উভয়কেই দেখিবে ততক্ষণ দ্বিত্বভাব বর্তমান থাকিবে এবং তাহার মন নির্বিকারভাবে একদিকে নিবিষ্ট থাকিবে না। এইজন্য ইহা চরম একত্ববাদ নহে।

চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ–এই শ্রেণীর তাওহীদ-জ্ঞান লাভ করিলে আল্লাহ্‌ পরিচয়ে বিভূষিত ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। সমস্তই এক বলিয়া দেখিতে পান ও এক বলিয়াই বুঝিতে পারেন। এইরূপ আরিফের নিকট দ্বিত্বভাবের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। সূফীগণের পরিভাষায় ইহাকে 'ফানা ফিত্তাওহীদ' (একত্ববাদে লয়প্রাপ্ত হওয়া) বলে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই–একদা হযরত হুসায়ন হাল্লাজ (র) হযরত খাওওয়াসকে (র) বিজন প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি এখানে কি করিতেছ?" তিনি বলিলেন–"আমি নিজকে তাওয়াক্কুল বিষয়ে অটল শিক্ষা দিতেছি।" হযরত হুসায়ন হাল্লাজ (র) বলিলেন–"তুমি ত অভ্যন্তরীণ সৌষ্ঠব বর্ধনে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছ। আচ্ছা বল ত, তুমি নিজের অস্তিত্ব কখন ভুলিবে এবং ইহার মাধ্যমে তাওহীদের মকামে কখন পৌঁছিবে?"

প্রথম শ্রেণীর তাওহীদ-বিশ্বাস অর্থাৎ মুখে ঈমানের কলেমা পাঠ করিয়া অন্তরে বিশ্বাস না করা মুনাফিকদের কাজ। ইহা কাঁচা আখরোটের বাহিরের ছাল সদৃশ। ইহা দেখিতে সুন্দর ও সবুজ কিন্তু খাইতে গেলে নিতান্ত বিস্বাদ লাগে। এই ছালের ভিতরের ভাগও মন্দ। ইহা পোড়াইতে গেলেও ধূম নির্গত হইয়া অগ্নি নিবাইয়া ফেলে। আবার ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন কাজে লাগে না; বরং অনর্থক গৃহের খালি স্থান আবদ্ধ করিয়া রাখে। বাহিরের ছালটির একমাত্র উপকারিতা এই যে, ইহাকে কিছু দিন আখরোটের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিতে দিলে ভিতরের ছালটি তাজা থাকে এবং ফলটি বিপদাপদ হইতে রক্ষা পায়। মুনাফিকদের তাওহীদের ঠিক এই অবস্থা। ইহা ত কোন কাজের নহে, তথাপি ইহা মুনাফিকদের দেহকে মুসলমানদের তলওয়ার হইতে রক্ষা করে। মুনাফিকগণ মুখে আল্লাহকে এক বলিয়া প্রকাশ করে এবং নিজদিগকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়। এইজন্য জিহাদে তাহাদিগকে মুসলমানদের শত্রু বলিয়া ধরা যায় না এবং বধও করা হয় না। এইরূপে তাহাদের মৌখিক তাওহীদের কারণে তাহারা মুসলমানের তলওয়ার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া

থাকে। কিন্তু মৃত্যু-ঘটনায় যখন তাহাদের দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়া কেবল আত্মাই আত্মা অবশিষ্ট থাকিবে তখন তাহাদের মৌখিক তাওহীদ আত্মারূপ শাঁসকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

নাজাতের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওহীদ আবশ্যক– আখরোটের ভিতরের ছাল জ্বালাইবার কাজে লাগে না। ইহা আখরোটের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিলে ইহার আবরণে শাঁস রক্ষা পায়—নষ্ট হয় না। কিন্তু শাঁসের তুলনায় এই ছাল নিতান্ত তুচ্ছ। সাধারণ লোক ও যুক্তিবাদীদের তাওহীদেরও ঠিক এই অবস্থা। এই শ্রেণীর তাওহীদ আত্মাকে দোযখের অগ্নি হইতে বাঁচাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধুর্য পাওয়া যায় না। আখরোটের শাঁস কাম্য ও প্রিয় বস্তু। কিন্তু শাঁসলব্ধ তৈলের সহিত তুলনা করিলে স্থূল পদার্থ হিসাবে ইহার মূল্য সামান্য মাত্র। আর শাঁস আখরোট ফলের সৌন্দর্যের চরম বিকাশও নহে। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদে পার্থক্য-জ্ঞান ও বহুত্বভাব বিদ্যমান থাকে এবং ইহা পূর্ণ হাওহীদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বরং চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদই ইহার চরম উন্নত সোপান। এই সোপানে উপনীত হইলে জগতের সকল পদার্থের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া কেবল এক আল্লাহ্ অবশিষ্ট থাকেন এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখা যায় না; তখন নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। ফলকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত নিজের সত্ত্বাও তখন দৃষ্টিগোচর হয় না।

চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ নিতান্ত কঠিন ও তাওয়াক্কুলের জন্য আবশ্যক নহে– প্রিয় পাঠক, তুমি হয়তো বলিবে, তাওহীদের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত দুর্বোধ্য। এই ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে, চক্ষের সম্মুখে অসংখ্য পদার্থ আছে, যেমন–আকাশ, পৃথিবী এবং অগণিত সৃষ্টবস্তু; আর এই সকল এক নহে; এমতাবস্থায় সবগুলিকে কি করিয়া এক মনে করিব? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুনাফিকের তাওহীদ মৌখিক, সর্বসাধারণের তাওহীদ অন্ধ অনুকরণপ্রসূত ও যুক্তবাদীদের তাওহীদ যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আরিফগণের তাওহীদ প্রত্যক্ষদর্শনলব্ধ। এই তিন শ্রেণীর তাওহীদ তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদ বুঝিতে পারাই নিতান্ত কঠিন। তাওয়াক্কুলের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদের প্রয়োজন হয় না। ইহার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদই যথেষ্ট।

যে-ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণীর তাওহীদের উচ্চতম সোপানে উপনীত হয় নাই

তাহাকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা বুঝানো নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মোটামুটিভাবে এখানে কিছু বর্ণনা করা যাইতেছে। বিশ্বজগতে এমন বহু পদার্থ আছে যাহারা সংখ্যায় বহু হইলেও তাহাদের মধ্যে এক প্রকার মিল থাকার দরুন তাহারা এক হইয়া পড়ে। আরিফগণ এইভাবেই অবলোকন করিয়া থাকনে। এইজন্য বিশ্বচরাচরের অগণিত পদার্থ তাহাদের নয়নগোচর হয় না; একমাত্র একজনকেই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। মানবদেহে গোশ্ত, চর্ম, মস্তিষ্ক, হস্তপদ, উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস থাকিলেও বাস্তবপক্ষে গোটা মানুষটি এক ও অভিন্ন। কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হইলে সকলেই তাহাকে এক ও অভিন্ন বস্তু বলিয়াই মনে করে; তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। মনে কর, তুমি এক ব্যক্তির কোন একটি অঙ্গমাত্র দেখিতে পাইলে, এমন সময় অপর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কি দেখিলে?' ইহার উত্তরে তুমি নিশ্চয়ই বলিবে–"আমি একের অধিক কিছুই দেখি নাই, একজন মানুষমাত্র।" কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয়জনের ভালবাসার বিষয় চিন্তা করিতেছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়–"তুমি কি ভাবিতেছ?" সে উত্তরে বলিবে–"আমি একের অধিক কিছুই ভাবিতেছি না–যাহার কথা ভাবিতেছি তিনি আমার একজন প্রেমাস্পদমাত্র।" উপরিউক্ত উভয় উত্তরেই বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও গোটা মানুষটিকে এক বলিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে।

মারিফাতের পথে এমন এক উন্নত মকাম আছে যেখানে উপস্থিত হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বজগতের সকল পদার্থ এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত আছে এবং এই মিলনের দরুন উহারা একই প্রাণীদেহবৎ হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর মধ্যেও তদ্রূপ পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ইহার প্রাণের সহিত যেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত পদার্থেরও স্বীয় পরিচালকের সহিত এক হিসাবে তদ্রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অবশ্য দেহ-পরিচালক প্রাণের সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, বিশ্ব পরিচালক আল্লাহ্র সহিত সর্ববিষয়ে সৃষ্ট পদার্থে তদ্রূপ সম্বন্ধ নাই। আর এক কথা এই যে–

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ –

এই বাক্যের মর্ম যতক্ষণ কেহ বুঝিতে না পারিবে ততক্ষণ তাওহীদ সম্বন্ধে উক্ত

সূক্ষ্ম বিষয়ও কেহ বুঝিতে পারিবে না। 'দর্শন' খণ্ডে এই বিষয়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক না বলিয়া নীরব থাকাই উত্তম। কারণ, ইহার বিস্তৃত আলোচনা ভাবোন্মত্ত লোকের জিঞ্জির ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং সাধারণ লোকেরাও উহা বুঝিতে পারে না।

তৃতীয় শ্রেণীর তাওহীদকে 'তাওহীদে ফে'লী' (ক্রিয়া-সম্পর্কিত তাওহীদ) বলা হয়। এই সম্বন্ধে 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয় বুঝিবার মত তোমার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে তথায় দেখিয়া লইতে পার। 'পরিত্রাণ' পুস্তকের 'শুকর' অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়া লওয়াই এই স্থলে যথেষ্ট মনে করি। তথায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

জাগতিক কার্যাবলীর মূল কারণ– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘ-বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি যাহাদিগকে তোমরা জাগতিক কার্যবলীর কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তৎসমুদয় লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় পরম কৌশলী আল্লাহ্র নিতান্ত অধীন। ইহারা স্বীয় স্বাধীন ক্ষমতায় একটু হেলিতে দুলিতেও পারে না। বরং আল্লাহ্ ইহাদিগকে প্রয়োজন মত যথাসময়ে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। যদি ইহাদিগকে কেহ কার্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে তবে মহা ভুল করা হইবে। এইরূপ বিবেচনা করা এবং পুরস্কার দানের আদেশ কলম দ্বারা লিখিত হয় বলিয়া কলম ও কাগজের উপর পুরস্কার দানের ক্ষমতা আরোপ করা একই কথা। তবে দেখা দরকার জীবনের কোন স্বাধীন ক্ষমতা আছে কি না। কেননা তোমরা মনে কর মানুষেরও কিছু ক্ষমতা আছে। অথচ এইরূপ মনে করা, মহাভ্রম। কেননা মানুষ অত্যন্ত নিঃসহায় ও একান্ত বশীভূত। এই কথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। অবশ্য মানুষের কার্য তাহার ক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু ক্ষমতা ইচ্ছার আজ্ঞাধীন। এমনকি মনে যেরূপ ইচ্ছা জন্মে মানুষ তদনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। এই ইচ্ছা আবার আল্লাহ্ জন্মাইয়া থাকেন এবং মানুষও তদনুসারেই ইচ্ছা করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ক্ষমতা যখন ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা মানুষের আয়ত্তে নাই তখন কোন কার্যই মানুষের আয়ত্তে নাই।

মানুষের কার্যের ত্রিবিধ সোপান–মানুষের কার্য কত প্রকার এবং কিরূপে উহা সম্পন্ন হয় যখন ইহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, কার্যের উপর মানুষের বাস্তবিকই কোন ক্ষমতা নাই। মানুষের

কার্যের তিনটি সোপান আছে। **প্রথম**–স্বাভাবিক কার্য। ইহার দৃষ্টান্ত এই—লোকে পানির উপর পা রাখিলে পা তৎক্ষণাৎ পানির মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেখিয়া লোকে বলিবে, মানুষের পা পানিরাশি বিদীর্ণ করিয়া ইহার এক ভাগকে অপর ভাগ হইতে পৃথক করত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে স্বাভাবিক কার্য বলে। **দ্বিতীয়**–ঐচ্ছিক কার্য। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। **তৃতীয়**–এখতিয়ারী কার্য। চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্গত।

এখন উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই কথা কাহারও অবিদিত নহে যে, স্বাভাবিক কার্যের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা চলে না। মানুষ কামনা করুক বা না করুক, স্বাভাবিক কার্য প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পন্ন হইবেই। পানি উপর পা রাখিলে পায়ের চাপে পানি আপনা-আপনি দুই ভাগ হইয়া পড়ে। ইহা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে। পানিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে প্রস্তরও ডুবিয়া যাইবে। ডুবিয়া যাওয়া প্রস্তরের ক্ষমতাভুক্ত কার্য নহে। পাথর ভারী বলিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা পানিতে ডুবিয়া যায়। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় ঐচ্ছিক কার্যগুলিও মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত। কারণ সে চেষ্টা করিলেও নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে পারে না। মানুষকে এমন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ইচ্ছা তাহার মধ্যে আপনা-আপনি জন্মে। কোন ব্যক্তি যদি দূর হইতে কাহারও চক্ষে সূচ নিক্ষেপ করিতে চাহে তবে অবশ্যই সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইবে। সে ইচ্ছা করিলেও চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ তাহাকে এমন করিয়া সৃষ্টিই করা হইয়াছে যে, আপনা-আপনিই তখন চক্ষু মুদ্রণ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে উদিত হয়। পানি উপর দাঁড়াইলে মানুষ যেমন ডুবিয়া যায়, চক্ষু-মুদ্রণ কার্যে তদ্রূপ আল্লাহ্র প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানবকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতছে যে, স্বাভাবিক এবং ঐচ্ছিক উভয় শ্রেণীর কার্য আল্লাহ্-সৃষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইতেছে, তন্মধ্যে মানুষের কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

এখন বাকী রহিল চলাফেরা করা, কথা বলা ইত্যাদি এখতিয়ারী কার্য। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীর কার্যগুলি লোকে ইচ্ছা করিলে করিতে পারে আর ইচ্ছা না করিলে বন্ধ রাখিতে পারে। সুতরাং এই শ্রেণীর কার্য করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই–এই কথা বলিলে প্রথমে স্বীকার

করিয়া লওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। জানিয়া রাখ, যে-কার্যে মঙ্গল আছে বলিয়া বুদ্ধি নির্দেশ দেয়, সেই কার্য করিতে মনে স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মে। কখন কখন সেই কার্যে মঙ্গল আছে কি না, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। মঙ্গল আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অবিলম্বে জাগ্রত হয় এবং সেই কর্ম সম্পাদন করিতে যে-অঙ্গের আবশ্যক মানুষ তাহা সঞ্চালন করিয়া থাকে। এই কারণে চক্ষে সূচ নিক্ষেপের ভয় দেখাইলে তৎক্ষণাৎ মনে এই কথার বিচার নিষ্পত্তি হয় যে, সূচ নিক্ষেপ করিলে ক্ষতি হইবে এবং চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এইস্থলে এইরূপ জ্ঞানটি স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্বদা মনে জাগ্রত থাকে বলিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বিনা-চিন্তাতেই বুঝা যায় যে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে উপকার হইবে। এই জ্ঞান-তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রণের ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয় এবং ইচ্ছার প্রভাবে সঞ্চালন-শক্তি আসিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলে। ধীর-স্থিরে চিন্তা করিয়া কার্য করিলেও এইক্ষেত্রে অনুরূপ কার্যই করিতে হইত। আবার দেখ, কাহাকেও প্রহার করিতে লাঠি উঠলে সে স্বাবতই দৌড়িয়া পলায়ন করে। এমতাবস্থায় যদি সে দৌড়িয়া কোন ছাদের কিনারায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং আঘাত করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার পশ্চাদানুসরণ করে তবে সেই ব্যক্তি আঘাত অপেক্ষা লাফ দিয়া পড়া সহজ বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া নিচে পড়িবে। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে, লাফ দিয়া পড়া অপেক্ষা আঘাত সহ্য করা সহজ তবে আপনা-আপনিই তাহার পা নিশ্চল হইয়া যাইবে এবং, লাফ দিয়া পড়িবার ক্ষমতাই তাহার মধ্যে থাকিবে না। কারণ লাফ দেওয়া ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা আবার বিবেকের নির্দেশ অনুসারে জাগ্রত হয়। বিবেকের বিচারে যে কার্য ভাল ও করিবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হয়, ইচ্ছা সেই কার্যের দিকেই ঝুকিয়া পড়ে।

আবার দেখ, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করিলে চাহিল। কিন্তু তাহার হস্তে প্রচুর শক্তি ও ছুরি থাকা সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করিতে পারে না। কারণ, হস্তের শক্তি ইচ্ছার অধীন এবং ইচ্ছা বিবেকের নির্দেশে চলে। বিবেক যখন বলে যে, এই কার্য তোমার জন্য ভাল এবং করিবার উপযুক্ত তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। আবার বিবেকও নিতান্ত পরাধীন এবং ইহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। কেননা, ইহা নির্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। যে-কার্য ভাল ইহার ছবি বিবেকরূপ দর্পণের উপর প্রতিফলিত হয়। আত্মহত্যা মন্দ কাজ; এইজন্য ইহার ছবি বিবেকরূপ দর্পণের উপর প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বিপদাপদে

জর্জরিত হইতে থাকে ও সহ্য করিতে অক্ষম হয় এবং যন্ত্রণা-ভোগ অপেক্ষা আত্মহত্যা সহজ বলিয়া মনে হয় তখন বিবেকরূপ দর্পণে উহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়।

এই শ্রেণীর কার্যকে এখ্‌তিয়ারী বলার কারণ এই যে, বুদ্ধিবলে কার্যের উপকারিতা বুঝা যায় মাত্র। নতুনা এই শ্রেণীর কার্যও অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই সকল কার্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং সূচবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করার ন্যায়ই। আবার শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া এবং চক্ষু বন্ধ করা কার্যদ্বয়ও পানিতে ডুবার ন্যায় আল্লাহ্-প্রদত্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সংঘটিত হয়। এইরূপে যাবতীয় কার্য-কারণের মধ্যে একটি কারণ অপর কারণের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে কারণগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটি শিকলের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। এই শিকলের কড়ি বহু। 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম' কিতাবে এই কারণ শৃঙ্খলের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জাগতিক কারণ–শৃঙ্খলের অন্তর্গত একটি কড়ি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্যই লোকে মনে করে যে তাহার ক্ষমতা আছে। এইরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল।

মানবের ক্ষমতা নিজস্ব নহে, সে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা-প্রবাহের স্থানমাত্র–মানব কেবল আল্লাহ্‌র ক্ষমতা-প্রবাহের একটি স্থানমাত্র। এতদ্ব্যতীত ক্ষমতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই মানবকে ক্ষমতাবান বলিয়া মনে করা মহা ভুল। ফলকথা, মানব আল্লাহ্‌র ক্ষমতা-প্রবাহের অন্তর্গত একটি মধ্যবর্তী স্থানমাত্র। আল্লাহ্‌ই এই ক্ষমতা মানবের মধ্যে জন্মাইয়া দিয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষ নড়ে বটে, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাতে নড়িবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কিছুই সৃষ্টি করেন না। এইজন্যই বৃক্ষকে কেহ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা-প্রবাহের স্থান বলিয়া মনে করে না এবং বায়ু-প্রবাহে বৃক্ষের দোলনকে পরপরিচালিত বলা হয়। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংঘটিত হয় এবং তাঁহার ক্ষমতা কোন কিছুরই অধীন নহে। এই কারণে ইহাতে 'ইখ্‌তিরা' (সৃষ্টি) বলে। মানুষের কার্য বৃক্ষের দোলনের ন্যায় সম্পূর্ণ পরপরিচালিত নহে; আবার আল্লাহ্‌র কার্যের ন্যায় সম্পূর্ণ নিজ অধিকারেও নহে। মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অন্যান্য কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল কারণের উপর তাহার কোন ক্ষমতা চলে না। মানুষের কার্য আল্লাহ্‌র কার্যের ন্যায় নহে বলিয়া ইহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। আবার মানুষ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রবাহস্থান হওয়াতে তিনি আবশ্যকমত মানুষের মধ্যে ক্ষমতা

ও ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন। তজ্জন্য বৃক্ষের ন্যায় মানুষ সম্পূর্ণ পরপরিচালিত নহে। কাজেই মানুষের কার্যকে অন্যের পরিচালিতও বলা চলে না। মানুষের কার্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এইজন্যই মানুষের কার্যের নিমিত্ত অপর একটি নাম বাহির করা হইয়াছে এবং ইহাকে 'কসব' (অর্জন) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও মানুষের কার্য এক হিসাবে তাহার ক্ষমতার মধ্যে আছে তথাপি তাহার নিজস্ব স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় তাহার ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হওয়ায় বাস্তবপক্ষে মানুষের স্বাধীন ক্ষমতায় কোন কার্য সংঘটিত হয় না।

তিনটি প্রশ্ন–প্রিয় পাঠক, এই স্থলে তুমি হয়ত বলিতে পার– (১) কার্যের উপর মানুষের যখন কোন ক্ষমতা নাই তখন মানুষ কেন পুরস্কার বা শাস্তি পাইবে? (২) শরীয়তই বা তাহার জন্য কেন নির্ধারিত হইয়াছে? (৩) অনেকে এইরূপ মনে করে যে, মানুষের ক্ষমতার মধ্যে কিছুই নাই, সমস্তই আল্লাহ্ করিয়া থাকেন। তাহারা আরও বুঝে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে শত চেষ্টা করিলেও দুর্গতি হইতে বাঁচিতে পারিবে না এবং যাহার অদৃষ্টে তখন সৌভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার পক্ষে চেষ্টার কোন দরকার নাই। এমতাবস্থায় চেষ্টা-তদবীর করিয়া কি লাভ? এইরূপ বিশ্বাস পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার নিদর্শন এবং বিনাশের কারণ। এই সকল বিষয়ের হাকীকত কোন গ্রন্থে লেখা উচিত নহে। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে যখন এতটুকু বলা হইল তখন কিছুটা আভাস দেওয়া যাইতেছে।

সাধারণের পক্ষে একটি ভয়াবহ বিনাশের স্থান–প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, তাওহীদের একটি ভয়াবহ মারাত্মক স্থান আছে। দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট বহু লোক এই অতল সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। পানির উপর দিয়া যে-ব্যক্তি চলিতে পারে সেই ব্যক্তি এইরূপ বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। পানির উপর দিয়া চলিবার শক্তি না থাকিলেও অন্ততপক্ষে যাহারা সন্তরণপটু তাহারাও রক্ষা পাইয়া থাকে। ডুবিয়া মরার ভয়ে সেই দুস্তর সমুদ্রের ভীষণ আবর্তে কেহ কেহ পদই স্থাপন করে না; এইরূপে তাহারা বাঁচিয়া যায়। সর্বসাধারণ লোক এই সমুদ্রের সংবাদ পায় নাই। সংবাদ পাইলে তাহারা অকস্মাৎ ইহাতে ডুবিয়া মরিতে পারে। সুতরাং তাহাদিগকে উক্ত উচ্চশ্রেণীর তাওহীদ-সমুদ্রের দিকে যাইতে না দেওয়া তাহাদের প্রতি মহাঅনুগ্রহ। এই সমুদ্রে যাহারা ডুবিয়া মরে তাহাদের

অধিকাংশই সন্তরণপটু নহে বলিয়া মারা যায়। আবার কতক লোক সন্তরণ বিদ্যা শিক্ষা না করার দরুন বা ইহা আবশ্যক বলিয়া না জানার নিমিত্ত ডুবিয়া মরে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর – প্রিয় পাঠক, তুমি বলিয়াছ–মানুষের যখন কোন স্বাধীন কার্যক্ষমতা নাই তখন পুরস্কার বা শাস্তি কেন হইবে? ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কথা ভালরূপে বুঝিয়া লও।

মন্দ কার্য করিলে আল্লাহ্ যে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাস্তি দিবেন এই কথা ঠিক নহে। তদ্রূপ সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ যে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পুরস্কার দিবেন, ইহাও মনে করিও না। এইরূপ কার্য আল্লাহর পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ। তোমার শরীরে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন ধাতু প্রবল হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে তোমার শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাকে রোগ বলে। তৎপর ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করিলে ও উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে শরীরে অন্য প্রকার অবস্থা আবির্ভূত হয়, তাহাকে স্বাস্থ্য বলে। এইরূপ, লোভ ও ক্রোধ তোমার মনে প্রবল হইয়া উঠিলে তুমি তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়। তাহাতে তোমার অন্তরে এক প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হইয়া অন্তরের অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতে থাকে এবং ইহাতেই তোমার বিনাশ সাধন হয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اَلْغَضَبُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ –

অর্থাৎ 'ক্রোধ দোযখের এক টুকরা।" অর্থাৎ যে-ক্রোধ তুমি অন্তরে জন্মাইয়া লইলে, অগ্নি-খণ্ডের ন্যায় ইহা তোমার অন্তর পোড়াইতে থাকে। বিবেকের আলোক শক্তিশালী হইলে যেমন ক্রোধরূপ অগ্নি নির্বাণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঈমানের আলোক দোযখের অগ্নি নির্বাণ করে। এইজন্য দোযখ বলিবে–

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَاِنَّ نُوْرَكَ اَطْفَا نَارِىْ –

অর্থাৎ "হে ঈমানদার, চলিয়া যাও। অবশ্যই তোমার নূর আমার অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিবে।" দোযখের এই ফরিয়াদ ভাষার সাহায্যে প্রকাশ না পাইলেও অবস্থারূপ ভাষায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈমানের নূর দর্শন করিবার শক্তি দোযখের নাই বলিয়াই সে পলায়ন করিবে। মশা যেমন বায়ু-প্রবাহ দেখিলে পলায়ন করে, ঈমানদারের নূর দেখিয়া দোযখও তদ্রূপ পলাইবে। এইরূপ বিবেকের আলোক দেখিয়া লোভাগ্নিও দূরে পলায়ন করে।

ফলকথা এই যে, তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্য স্থান হইতে কোন কিছুই আনয়ন করা হইবে না। বরং তোমার অর্জিত জিনিসই তোমাকে দেওয়া হইবে। এইজন্যই বর্ণিত আছে–

اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ اِلَيْكُمْ –

অর্থাৎ "তোমাদের কৃতকার্যই দোযখের রূপ ধারণপূর্বক তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে।" সূতরাং তোমার ক্রোধ ও বাসনা-কামনাই তোমার দোযখের মূল কারণ। ইহা তোমার সঙ্গে তোমার অন্তরেই বর্তমান আছে। ধ্রুবজ্ঞান থাকিলে তুমি অবশ্যই ইহা দেখিতে পাইতে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ـ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ –

অর্থাৎ "কখনই নহে। তোমাদের যদি ধ্রুবজ্ঞান থাকিত তবে নিশ্চয়ই দোযখ দেখিতে পাইতে।" (সূরা তাকাসুর, ৩০ পারা।)

বিষ পান করিলে মানুষ পীড়িত হয় এবং অবশেষে প্রাণ হারায়। বিষের এইরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বলিয়া কেহই তৎপ্রতি ক্রুদ্ধও হয় না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করেন না। বিষ যেমন মানবদেহ পীড়িত করে, পাপ কার্য এবং বাসনা-কামনাও তদ্রূপ মানবাত্মাকে পীড়িত করিয়া ফেলে। আত্মার পীড়া মানবাত্মাকে অগ্নির ন্যায় পোড়াইতে থাকে। এই অগ্নি দোযখের অগ্নির সমজাতীয়–এই জগতের অগ্নির সমজাতীয় নহে। চুম্বক লোহা যেমন ইহার সমজাতীয় লোহাকে স্বীয় অভিমুখে আকর্ষণ করে, দোযখও তদ্রূপ দোযখী লোককে স্বীয় অভিমুখে টানিয়া আনে। ইহা কাহারও ক্রোধের ফলে হয় না। সওয়াবের অবস্থাও এই প্রকার অনুমান করিয়া লও। কেননা, এই সম্বন্ধে বলিতে গেলে বর্ণনা নিতান্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর–তুমি বলিয়াছিলে–শরীয়ত কি উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কেন জগতে এত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন? ইহার উত্তর এই—মানুষকে শাসনে রাখিয়া জবরদস্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ করত বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবার জন্যই আল্লাহ এত পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন এবং শরীয়তবিধি প্রচার করিয়াছেন। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اَتُعْجِبُ مِنْ قَوْمٍ يُّقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ –

অর্থাৎ "তুমি কি সেই কওম দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছ, যাহারা শিকলে আবদ্ধ হইয়া বেহেশতের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে?" ইহার মর্ম এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ মানবকে জোরজবরদস্তি ফাঁদে আটকাইয়া দোযখের পথ হইতে টানিয়া লইতেছেন। এই সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اَنْتُمْ تَتَهَافَتُوْنَ عَلَى النَّارِ وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجْزِكُمْ –

অর্থাৎ "তোমরা পতঙ্গের ন্যায় নিজকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ। আর আমি তোমাদিগকে আগুনে পতিত হইতে না দিবার জন্য তোমাদের কোমরে ধরিয়া টানিতেছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা যে-শিকলে আবদ্ধ করিয়া মানবকে দোযখের দিক হইতে টানিয়া লইতেছেন, পয়গম্বরগণের উপদেশ সেই শিকলের একটি কড়ি। তাঁহাদের উপদেশে মনে জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানে তোমরা কোন্‌টি সুপথ, কোন্‌টি কুপথ চিনিয়া লইতে পার। পয়গম্বরগণ সেই সকল কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। এই জ্ঞান ও ভয় জ্ঞানরূপ দর্পণে সঞ্চিত ধূলাবালি দূর করে। ফলে পার্থিব রাস্তা পরিত্যাগ করত পরকালের পন্থা অবলম্বন করা যে হিতকর, এই ছবি জ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং পরকালের পন্থা অবলম্বনের ইচ্ছা মনে জাগিয়া ওঠে। এমন কি ইচ্ছার প্রভাবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনা-আপনিই সঞ্চালিত হয়; কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইচ্ছার অধীন। এখন ভাবিয়া দেখ, পয়গম্বরের উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম চেষ্টা পর্যন্ত কার্য ও কারণসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া কেমন শিকলের ন্যায় হইল এবং এই শিকলে বন্ধন করত কেমন জবরদস্তির সহিত দোযখ হইতে টানিয়া আনিয়া তোমাদিগকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পয়গম্বর আলায়হিস্ সালামগণকে এমন রাখালের সহিত তুলনা করা চলে যাহার নিকট একটি পশুপাল ও একটি শস্যশ্যামল চারণভূমি আছে এবং বাম পার্শ্বে বহু ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ পর্বতগুহা বর্তমান রহিয়াছে। আর রাখাল গুহার ধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া লাঠি সঞ্চালন করিতেছে যেন লাঠির ভয়ে ছাগলগুলি গুহার ত্রিসীমায়ও না আসে এবং চারণভূমির দিকে গমন করে। ইহা পয়গম্বরগণকে

জগতে পাঠাইবার উদ্দেশ্য। তাঁহারা দোযখের ধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই দিক হইতে মানবজাতিকে বেহেশ্‌তের দিকে প্রেরণ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর – তৃতীয় প্রশ্ন এই–সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে চেষ্টা-তদবীর করিলে কি লাভ? যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তাহার মনে এইকথা নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন–'চেষ্টা-তদবীর করিলেও কোন লাভ নাই।' তজ্জন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকে। অতএব সে বীজও বপন করে না এবং শস্যও কাটিতে পারে না। যাহার ভাগ্যে অনাহারে মৃত্যু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার লক্ষণ এই যে, তাহার মনে এইকথা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে–'যখন অনাহারে মরিতেই হইবে তখন আহার গ্রহণে কি লাভ?" এইরূপ ব্যক্তি আহার গ্রহণ না করিলে অবশ্যই অনাহারে মরিবে। এইরূপ যাহার অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে মনে করে–'আমার অদৃষ্টে যখন দরিদ্রতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তখন কৃষিকার্য করিয়া কি লাভ?' এই কথা ভাবিয়া সে বীজও বপন করিবে না এবং শস্যও কাটিবে না। আল্লাহ্ যাহার ভাগ্যে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি এই কথাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাকে ধনী হইতে হইবে এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য অবলম্বনপূর্বক সংস্থান করিতে হইবে।

এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধবদ্ধ ব্যাপার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করা নিরর্থক নহে; বরং কার্য-করণের সহিত সকল কাজই সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহাকে যে-কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্যের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। বিনা-উপকরণে তিনি কাহাকেও কোন কার্য সম্পাদনে প্রেরণ করেন না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন–

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهُ –

অর্থাৎ "কার্য করিয়া যাও। যাহাকে যে-কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই কাজ তাহার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

আল্লাহ্ জবরদস্তির সহিত তোমার মনে যে অবস্থা সৃষ্টি করেন এবং যে-কার্য তোমার দ্বারা করাইয়া লইয়া থাকেন, উহাকে তুমি স্বীয় পরিণামের পূর্বসংবাদ বলিয়া গ্রহণ কর। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তোমার আসক্তি ও চেষ্টা প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে পূর্ণ অধ্যবসায় ও সচেতন আলস্যহীনতা বর্তমান থাকিলে বুঝিবে

আল্লাহ্ তোমাকে বিদ্বান করিয়া সমাজের নেতা করিবেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপর পক্ষে অকর্মণ্যতা ও অলসতা যদি তোমার মনে প্রবল হইয়া থাকে তবে এই নিরর্থক কথা তোমার মনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে–'সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার ভাগ্যে মূর্খতার আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া কি লাভ?" তাহা হইলে এই ভাবকে তোমার দুর্ভাগ্যের হুকুমনামা বলিয়া মনে করিবে এবং জানিয়া রাখিবে যে, তুমি কখনও সমাজের নেতা হইতে পারিবে না। পরকালের কার্য দুনিয়ার কার্যের অনুরূপ অনুমান করিয়া লও। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ –

অর্থাৎ "তোমাদের সৃজন এবং উত্থান একজনের সৃজন-উত্থানের সদৃশ ব্যতীত আর কিছু নহে।" (সূরা লুকমান, ৩ রুকূ, ২১ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ –

অর্থাৎ "তাহাদের জীবন এবং মরণ উভয়ই সমান।" (সুরা জাসিয়া, ২ রুকূ, ২৫ পারা)।

উপরিউক্তি তত্ত্বসমূহ বুঝিয়া লইলে পূর্বোক্ত তিনটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর তোমার নিকট সহজ হইয়া উঠিবে এবং তাওহীদের উপর তুমি দৃঢ় থাকিতে পারিবে। ইহাও ভালরূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শরীয়ত, বিবেক এবং তাওহীদের মধ্যে কোন বিপরীত ভাব নাই, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তদপেক্ষা অধিক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণনা করা চলে না।

তাওয়াক্কুলের অপর ভিত্তি ঃ আল্লাহকে পূর্ণ দয়াবান বলিয়া বিশ্বাস–পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাওয়াক্কুল দুইটি বিষয়ে ঈমানের ফল। প্রথম তাওহীদের প্রতি ঈমান। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। দ্বিতীয় এই–তুমি এই কথা বিশ্বাস কর এবং জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও তিনি বিশ্বজগতের সকল পদার্থের কারণ। তাঁহা হইতে সব হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতিশয় জ্ঞানী এবং পরম করুণাময়। প্রতিটি পিপীলিকা, মশামাছি হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির সেরা মানুষ পর্যন্ত সকলের প্রতি তাঁহার দান ও মমতা সন্তানের প্রতি জননীর দান ও মমতা অপেক্ষা অধিক। এই মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে। এই কথাও জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ বিশ্বজগত ও তদন্তর্গত

প্রত্যেক বস্তু এরূপ পূর্ণতা দিয়া, এমন সৌন্দর্য ও কৌশল সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। তৎসঙ্গে ইহাও জানিয়া লও যে, আল্লাহ্ কাহাকেও স্বীয় দয়া হইতে বঞ্চিত করেন না এবং তিনি যে পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেরূপ করা উচিত, ঠিক সেইরূপই করিয়াছেন। জগতের সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি পূর্ণবুদ্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয় এবং তাহারা সকলে একত্র হইয়া বিশ্বজগতের কোন প্রাণীর কেশাগ্র ও মশার পালক যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হইয়াছে উহা লইয়া চিন্তা করিতে থাকে তবে এমন মন্তব্য কেহই করিতে পারিবে না যে, উহা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল না, বরং তেমন হইলে ভাল হইত–অথবা ছোট বা বড়, নিকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাহারা এরূপ কোন ত্রুটিই খুঁজিয়া পাইবে না এবং বুঝিতে পারিবে যে, উহা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে।

যে পদার্থ নিতান্ত কদর্য ইহার পূর্ণতা সেই কদর্যতার মধ্যেই রহিয়াছে। ইহা যদি কদর্য না হইত তবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং কদর্য পদার্থ সৃষ্টির মধ্যে যে হেকমত নিহিত আছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। কেননা মন্দ দ্রব্য না থাকিলে কেহই উত্তম দ্রব্যের মর্যাদা বুঝিত না এবং উত্তম দ্রব্য উপভোগে আরামও পাইত না। অপূর্ণ বস্তু না থাকিলে 'পূর্ণ' বলিয়া কোন কথাই থাকিত না এবং যে পূর্ণ সে স্বীয় পূর্ণতার মাধুর্য লাভ করিত না। কারণ, পূর্ণকে অপূর্ণের পাশাপাশি রাখিলে পরস্পর তুলনা করিয়া উভয়কে চেনা যায়। যেমন, একজন পিতা হইলেই অপর জন্য পুত্র হয়। পুত্র না হইলে পিতা কথাটিই থাকিত না। এই সকল স্থানে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের তুলনা করিলে চেনা যায়। তুলনা স্থলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। দ্বিত্বভাব তিরোহিত হইলে তাওহীদ-জ্ঞান লাভ হয়। তখনই সমস্ত পদার্থ এক হইয়া পড়ে এবং তুলনা ও তুলনীয় বস্তু সবই লোপ পায়।

প্রিয় পাঠক, অবগত হও যে, আল্লাহ্ কার্যাবলীর হেকমত মানব হইতে গোপন রাখিয়াছেন। মানবের মঙ্গলের জন্যই তিনি ইহা করিয়াছেন। আরও বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ যে কার্যের আদেশ করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন এবং যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তদ্রূপই করিয়া লন। দুনিয়াতে রোগ-শোক, অক্ষমতা, এমন কি পাপ, কুফ্‌র, বিনাশ, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহ্ হেকমত রাখিয়াছেন এবং তৎসমুদয় যেরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল, ঠিক সেইরূপই করিয়াছেন। যাহাকে

তিনি দরিদ্র করিয়াছেন, সেই অবস্থাতে তাহার মঙ্গল রহিয়াছে। দরিদ্র না হইয়া ধনী হইলে সে বিনাশ পাইত। যাহাকে তিনি ধনী করিয়াছেন তাহার মঙ্গলও তদ্রূপ তাহার অবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে।

আল্লাহ্ যে পূর্ণ করুণাময় এই কথার মর্মও তাওহীদের ন্যায় এক অতল সমুদ্র। অনেক লোক এই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহাতে অদৃষ্টবাদের গোপন রহস্য রহিয়াছে এবং সাধারণ লোকের নিকট এই রহস্য উদ্ঘাটনের অনুমতি নাই। এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করিতে গেলে কথা অতি লম্বা হইয়া যাইবে। যাহা হউক, উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহাই ঈমানের দৃঢ় মর্ম এবং তাওয়াক্কুলের জন্য ইহাই আবশ্যক

তাওয়াক্কুলের হাকীকত–তাওয়াক্কুলে মানব-হৃদয়ের একটি উন্নত অবস্থা। তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র পূর্ণ দয়ার উপর ঈমান আনার ফলে মানব এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাওয়াক্কুলের অবস্থা লাভের উপায় হইল প্রকৃত কার্য-নির্বাহক আল্লাহ্ তা'আলার উপর আন্তরিক ভরসা স্থাপন করা ও এই ভরসাকে সুদৃঢ় করিয়া লওয়া এবং তাহার ফলে মন নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত হইয়া পড়া যাহাতে মন জীবিকা সংগ্রহে আবদ্ধ না থাকে। তৎসঙ্গে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায় বিনষ্ট হইয়া গেলে ভগ্নহৃদয় না হওয়া বরং এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া থাকা যে, তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা দান করিবেন। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি প্রবঞ্চনাপূর্বক অপর একজনের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার জন্য এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিল। সম্পত্তির মালিক বাদীর দাবী ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীলের আশ্রয় গ্রহণ করির। উকীলের তিনটি গুণের উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হইলে সে তাহার উপর খাঁটিভাবে নির্ভর করিতে পারে; যথা–(১) সর্বপ্রকার দুরভিসন্ধি ও প্রতারণা সম্বন্ধে উকিল ভালরূপে অবগত আছে। (২) যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে প্রতারকের দাবী খণ্ডন করিতে উকীলের যথেষ্ট সাহস ও বাকপটুতা আছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, আইন-বিশারদ হইলেও সাহস ও বাকপটুতার অভাবে উকীল স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। (৩) বাদীর প্রতি উকীল অত্যন্ত দয়ালু এবং তাহার স্বার্থ রক্ষার্থে সে খুব আগ্রহশীল। উকীলের এই ত্রিবিধ গুণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে মানুষ স্বীয় কার্য তাহার উপর অর্পণ করত নিজে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে এবং সেই মোকদ্দমায় অন্যান্য সকল চেষ্টা-তদবীর পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। এইরূপ যে ব্যক্তি–

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ অতি উত্তম প্রভু এবং অতি উত্তম কার্য-নির্বাহক"–এই আয়াতের মর্ম ভালরূপে বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে যে, যাহা কিছু হয় তাহা আল্লাহ্ কর্তৃকই হইয়া থাকে–তিনি ব্যতীত অপর কোন কর্মকর্তা নাই, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তিতে বিন্দুমাত্রও কমতি নাই এবং তাঁহার রহমত এত অসীম যে, ইহা অপেক্ষা অধিক হওয়াই অসম্ভব। এইরূপ ব্যক্তি তখন আল্লাহ্র দান ও করুণার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা তদ্‌বীর পরিত্যাগ করিতে পারে এবং বুঝে যে, জীবিকা নির্ধারিত আছে; সময় মত ইহা আসিয়া পৌঁছিবে এবং আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত কার্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে।

মানব-প্রকৃতি বিশ্বাসের খেলাফ হওয়া অসম্ভব নহে–যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরিউক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি অকাট্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার মনে যে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক টানে অপরিপক্কতা এবং নৈরাশ্যভাব থাকিতে পারে না, এমন নহে। কারণ, মানুষ কোন বিষয় অকাট্যভাবে জানিতে পারিলেও তাহা প্রকৃতি সহসা ইহা গ্রহণ করিতে চায় না। বরং কোন কোন সময় মানব-প্রকৃতি অলীক কল্পনার বশীভূত হইয়া চলে যদিও তাহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে তদ্রূপ কল্পনা করা নিতান্ত ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তি হালুয়া খাইতেছে, এমন সময় অপর ব্যক্তি এই হালুয়াকে পায়খানার সহিত তুলনা করিল। তখন সেই ব্যক্তি ইহা খাইতে পারে না; অথচ সে ভালরূপে অবগত আছে যে, তুলনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবার দেখ, মৃতদেহকে সকলেই প্রস্তরবৎ নিতান্ত অক্ষম এবং নিশ্চল বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। তথাপি কেহ ইচ্ছা করিলেও একাকী রাত্রিকালে মৃতদেহের সহিত শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না।

ফলকথা এই যে, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রচুর মানসিক বল অপরিহার্য। কারণ, মনের দুর্ভাবনা বিদূরিত না হইলে শান্তি পাওয়া যায় না এবং সম্পূর্ণরূপে ভরসা করা চলে না। আবার সম্পূর্ণরূপে ভরসা করিতে না পারিলে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হইতে পারা যায় না। কেননা সর্ববিধ কার্যকলাপে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র উপর ভরসা করাকেই তাওয়াক্কুল (নির্ভরশীলতা) বলে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান ছিল। কিন্তু তবুও তিনি বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ বলিলেন–'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন–'হাঁ, বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু আমার অন্তরের শান্তির জন্য দেখাও।" (সূরা বাকারাহ, ৩৫ রুকূ, ৩ পারা।) তিনি এইজন্য ইহা বলিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় অন্তরের শান্তি খেয়ালের অধীন থাকে। কিন্তু সেই অবস্থা উন্নত হইয়া চরম সীমায় উপনীত হইলে অন্তর বিশ্বাসের অধীন হইয়া পড়ে এবং তখন আর প্রত্যক্ষ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

তাওয়াক্কুলের শ্রেণীবিভাগ–তাওয়াক্কুল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী ব্যক্তির অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য একজন সুচতুর, অভিজ্ঞ, বাকপটু, সাহসী, দয়ালু উকীল নিযুক্ত করত তাহার উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকের অবস্থা দুগ্ধপোষ্য শিশুর তুল্য; সকল বিপদাপদে মাতা ব্যতীত অপর কাহাকেও সে জানে না, ক্ষুধিত হইলে মাতার নিকট ক্রন্দন করে এবং ভয় পাইলে তাহার কোলেই আশ্রয় লয়। শিশু নিজ ক্ষমতায় চেষ্টাচরিত্র করিয়া এইরূপ করে না; বরং ইহাই তাহার স্বভাব। এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র গুণে মুগ্ধ হইয়া এরূপ ডুবিয়া থাকে যে, স্বীয় নির্ভরশীলতার খবরও তাহারা রাখে না। প্রথম শ্রেণীর লোক নিজের নির্ভরশীলতা নিজে বুঝে এবং নিজ ক্ষমতায় চেষ্টা-চরিত্র করিয়া নিজকে তাওয়াক্কুল করিতে শিখায়। যে-ব্যক্তি মৃতদেহকে গোসল দেয় তাহার হস্তে মৃতদেহের অবস্থা যেরূপ তৃতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকের অবস্থাও তদ্রূপ। এই শ্রেণীর লোকে নিজকে মৃতদেহের ন্যায় অক্ষম বিবেচনা করে এবং তাহার দেহের নড়াচড়া তাহা হইতে হয় বলিয়া মনে করে না; বরং আল্লাহ্র শক্তির প্রভাবে হয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে, যেমন মৃতের গোসল প্রদানকারী নড়াইলে মৃতদেহ নড়িয়া থাকে নচেৎ অচল থাকে। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে শিশু যেমন মাতাকে আহবান করে, তাহারা কিন্তু তদ্রূপ প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্র নিকট তজ্জন্য দু'আ করে না। বরং তাহাদের অবস্থা এমন

শিশুর সদৃশ যে-শিশু জানে যে মাতা তাহার অবস্থা ভালরূপে অবগত আছে এবং বিনা প্রার্থনায় নিজে নিজে তাহার অভাব মোচন করিবে।

তিন শ্রেণীর নির্ভরশীল লোকের তুলনা–যাহা হউক, তৃতীয় শ্রেণীর নির্ভরশীল লোকের কোন ক্ষমতা থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরও ক্ষমতা থাকে না বটে, কিন্তু নিজের অক্ষমতা, প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা বাকী থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা থাকে, কিন্তু উকীলের স্বভাব ও অভ্যাস হইতে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক বুঝা যায়, তৎসমুদয় সংগ্রহে একই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, উকীলের অভাস জানা আছে যে, মুওয়াক্কেল উপস্থিত না থাকিলে এবং দলীলপত্র হাযির না করিলে সে মোকদ্দমা চালায় না তবে বাধ্য হইয়াই তদ্রূপ আয়োজন ও যোগাড় করিয়া দিতে হয়। মুওয়াক্কেল এই সকল করিয়াও উকীলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত তাহার দিকেই চাহিয়া থাকে এবং যে-ফল লাভ হয় উকীলকেই ইহার কর্তা বলিয়া গণ্য করে। এমন কি উকীলের নির্দেশে দলীলপত্র হাযির করা হইয়াছিল বলিয়া এই কাজটিকেও সে উকীলের কৃতকর্ম বলিয়াই বিবেচনা করে।

যাহা হউক, প্রথম শ্রেণীর তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী লোকেরা প্রচলিত ধারা অনুসারে যে কার্যের জন্য যে উপকরণ-উপাদান সংগ্রহের নিয়ম আছে, যেমন–বাণিজ্য, কৃষিকার্য ইত্যাদি বাহ্য উপকরণ-উপাদন–অবলম্বনে বিরত থাকে না। এই সকল উপাদান-উপকরণ পরিত্যাগ না করিলেও তাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। কারণ তাহারা কৃষি-বাণিজ্যের উপর ভরসা করে না; বরং আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার উপর করিয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে যে, আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যেরূপ চেষ্টা ও বল জন্মাইয়া দেন—কৃষি-বাণিজ্যের উপাদান-উপকরণ দেখাইয়া ও সংগ্রহ করিয়া দেন এবং কার্যপদ্ধতি শিখাইয়া দেন, তদ্রূপ তিনিই কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্যে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন। তাহাদের সম্মুখে যে বস্তু বা ব্যাপার আসিয়া পড়ে তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই আসে বলিয়া তাহারা মনে করে। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে আসিবে।) ইহাই لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه – বাক্যের সারমর্ম। কেননা حول শব্দের অর্থ 'গতি' এবং قوة শব্দের অর্থ 'শক্তি'। মানুষ যখন বুঝে যে, গতি ও শক্তি তাহার নিজের নহে, বরং উহা আল্লাহ্‌র দিক হইতে আসিতেছে তখন যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই দেখা যায়।

মোটের উপর কথা এই, বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য একমাত্র আল্লাহ্ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে ও তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে, অপর কোন প্রকাশ্য কারণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না, ইহা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল।

উচ্চশ্রেণীর তাওয়াক্কুল –সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাওয়াক্কুল কাহাকে বলে, তাহা হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (র) প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আবূ মূসা দায়েলী (র) তাঁহাকে তাওয়াক্কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন– "তোমরা কাহাকে তাওয়াক্কুল বল?" উত্তরে হযরত আবূ মূসা দায়েলী (র) বলিলেন–"বুযুর্গগণ বলিয়াছেন–অগণিত বিষধর সর্পে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তোমার হৃদয় যদি সূক্ষ্ম কেশাগ্র পরিমাণও বিচলিত ও ভীত না হয় তবে ইহাকেই তাওয়াক্কুল বলে।" হযরত আবূ ইয়াযীদ (র) বলিলেন–"ইহা ত নিতান্ত সহজ। আমার মতে দোযখবাসীদিগকে সর্ববিধ শাস্তিতে এবং বেহেশ্‌তবাসীদিগকে অফুরন্ত সুখ ও আনন্দে বিভোর দেখিয়া যে ব্যক্তি এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রভেদ করে, সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল নহে।" কিন্তু হযরত মূসা দায়েলী (র) যে তাওয়াক্কুলের কথা বলিয়াছেন তাহাও অতি উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন না করা জরুরী নহে। কারণ, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু যখন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের সহিত পর্বতকন্দরে ছিলেন তখন স্বীয় পায়ের গোড়ালি দ্বারা সর্পগর্তের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন; অথচ তিনি আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার সাপের ভয় ছিল না; বরং সৃষ্টিকর্তার ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন–কি জানি, আল্লাহ্ সাপের মনে দংশনের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মাইয়া দিতে পারে। এইরূপ নির্ভরশীল ব্যক্তি সকল পদার্থে – لَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه কলেমার অর্থ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামীর (র) উক্তিতে সেই ঈমানের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যাহা তাওয়াক্কুলের মূল এবং উহা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। এই ঈমান হইল আল্লাহ্‌র হেকমত, ন্যায়বিচার, দয়া ও করুণার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ভালরূপে উপলব্ধি করা যে, আল্লাহ্ যাহা কিছু মনে করেন তাহা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তিনি ঠিক তদ্রূপই করিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে আল্লাহ্-প্রদত্ত শাস্তি ও পুরস্কারে কোনই পার্থক্য থাকে না।

তাওয়াক্কুলের ক্রিয়াকলাপ–তিনটি মূলের উপর ধর্মের মকামসমূহ স্থাপিত আছে; যথা– (১) ইলম, (২) হাল (মানসিক অবস্থা) (৩) আমল। কোন্ প্রকার ইল্‌ম অর্জন করিলে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করা যায় এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিলে মনের অবস্থা কিরূপ হয় তৎসমুদয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকার আমল (কাজ) করিলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা হয়, এই বর্ণনাই এখন বাকী আছে।

তাওয়াক্কুলের নামে কর্ম-পরিত্যাগ শরীয়ত-বিরুদ্ধ–এ-স্থলে কেহ হয়ত মনে করিবে, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিতে হইলে সকল কাজ আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এমন কি কৃষি-বাণিজ্য বর্জন করিবে, আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে হইবে না; সর্প, বিচ্ছু, ব্যাঘ্র হইতে পালাইতে হইবে না; পীড়া হইলে ঔষধ সেবন করিবে না–এইরূপ সকল ধারণাই ভুল। কারণ, এই সমস্তই শরীয়ত-বিরুদ্ধ। তাওয়াক্কুলের ভিত্তি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শরীয়ত-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া কিরূপে তাওয়াক্কুল হইতে পারে?

তাওয়াক্কুলের চতুর্বিধ মকাম–বরং চারিটি বিষয়ে মানবের অধিকার আছে; যথা–(১) যে-সম্পদ নাই তাহা সংগ্রহ করা, (২) সঞ্চিত সম্পদের হেফাযত করা, (৩) উপস্থিত ক্ষতি হইতে অব্যাহতির জন্য উপায় অবলম্বন এবং (৪) যে-ক্ষতি এখন সম্মুখে আসে নাই ইহাকে আসিতে না দিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। এই চারিটি মকামের প্রত্যেকটিতে কি নিয়মে কার্য চালাইলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বজায় থাকে তৎসম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। অতএব সেই সকল কার্য পরিচালনের নিয়ম বর্ণনা করা আবশ্যক। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মকাম–উপকারী বস্তু বর্জন। ইহার তিনটি শ্রেণী আছে।

প্রথম শ্রেণী– আল্লাহ্‌র প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যে-উপকরণ অবলম্বন না করিলে কার্যনির্বাহ হয় না, উহা পরিত্যাগ করা পাগলামি, তাওয়াক্কুল নহে। যেমন–আল্লাহ্ স্বয়ং উদর পূর্ণ করিয়া দিবেন, এই খেয়ালে হাতে আহার ধরিয়া মুখে না দেওয়া; অথবা খাদ্যদ্রব্যকে আহ্বান করা যেন ইহা আপনা-আপনি গলার মধ্য দিয়া উদরে প্রবেশ করে। আবার বিবাহ ও স্ত্রীসহবাস না করিয়া সন্তান লাভের আশা করা। এবংবিধ উপকরণাদি পরিত্যাগপূর্বক আল্লাহ্‌র উপর

ভরসা করিয়া থাকা বাস্তবপক্ষে নিতান্ত মূর্খতা। যে-স্থলে নিশ্চিত কার্যকারণ আছে তথায় ক্রিয়াকলাপে (অর্থাৎ উক্ত কারণ পরিত্যাগে) তাওয়াক্কুল হয় না; বরং জ্ঞান ও মানসিক অবস্থাতে তাওয়াক্কুল হইয়া থাকে। জ্ঞান এই–নিশ্চিতভাবে জানা যে, হস্ত, আহার, শক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, মুখ, দন্ত ইত্যাদি সকলই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানসিক অবস্থা–আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণার প্রতি মনের ভরসা থাকা, হস্ত ও আহার্য সামগ্রীর উপর ভরসা না করা। কারণ, অসম্ভব কি যে, অকস্মাৎ মানুষের হস্ত অবশ হইয়া পড়িতে পারে এবং অপর কেহ তাহার সম্মুখস্থ খাদ্য কাড়িয়া লইতে পারে! সুতরাং একমাত্র আল্লাহর করুণার উপর ভরসা রাখা আবশ্যক; কারণ তিনি তোমার হস্ত ও খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা নিরাপদে রাখিয়াছেন। নিজ বাহুবলের উপর ভরসা করা মানুষের উচিত নহে।

দ্বিতীয় শ্রেণী– এই শ্রেণীর উপকরণগুলি অপরিহার্য নহে; কিন্তু সচরাচর উহার অভাবে কার্য সম্পন্ন হয় না। উহা ব্যতীত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া বড় দুষ্কর। পাথেয় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাওয়াক্কুলের জন্য পাথেয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক নহে; বরং পাথেয় সঙ্গে লওয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম ও পূর্বকালের বুযুর্গগণের অভ্যাস। কিন্তু পাথেয়ের উপর ভরসা করা উচতি নহে; কেননা, পাথেয় দ্রব্য অপর লোকে কাড়িয়া লইয়াও যাইতে পারে। বরং যে-আল্লাহ্ পাথেয় সৃষ্টি করিয়া নিরাপদে রাখেন তাঁহার উপর ভরসা করা উচিত। অপর দিকে যে-ব্যক্তির সপ্তাহকাল পর্যন্ত অনাহারে ক্ষুধা সহ্য করিবার বা ঘাসপাতা খাইয়া জীবনধারণ করিবার শক্তি আছে তাহার পক্ষে পাথেয় না লইয়া বিজন অরণ্যে যাওয়া তাওয়াক্কুলের বহির্ভূত নহে। কারণ, উহা তখন তাহার জন্য একেবারে আহার ত্যাগের ন্যায় শরীয়ত-বিরুদ্ধ নহে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা অসঙ্গতও নহে। এইরূপ নির্ভরশীল পথিকের জন্য বিজন অরণ্যেও এমন স্থান হইতে আহার্য মিলিতে পারে যাহা কল্পনাও তাহার মনে উদিত হয় না। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে উক্ত দুইটি গুণ অর্থাৎ আহার্যসামগ্রী পাওয়া না গেলে সপ্তাহকাল অনাহারে থাকা বা ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন যাপনের ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তিনি পাথেয় সঙ্গে না লইয়া বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সুঁচ, ছুরি, দড়ি, বালতি থাকিত। কারণ, বিজন বনে এই সমস্ত জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপকরণরূপে

পরিগণিত। কেননা, বিজন অরণ্যে দড়ি-বালতি কোথায় পাওয়া যায়! সুতরাং পানি তোলা অসম্ভব হয়। আবার পরিধানের বস্ত্র ছিড়িয়া গেলে সূঁচ ব্যতীত সেলাই করা যায় না।

ফলকথা এই যে, অপরিহার্য উপকরণ পরিহার করা তাওয়াক্কুল নহে। বরং মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়ার উপর ভরসা রাখা এবং উপকরণের উপর ভরসা না করাকে তাওয়াক্কুল বলে। ঘাস-পাতাও জন্মে না, এমন বিজন পর্বত-কন্দরে গিয়া যদি কেহ মনে করে 'জীবিকা বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়াছি' তবে এরূপ তাওয়াক্কুল করা হারাম। এমন নির্ভরশীল ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয় এবং আল্লাহ্‌র প্রচলিত নিয়ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ নির্ভরশীল লোককে এমন ব্যক্তির সহিত তুলনা করা চলে, যে উকীলের নিকট দলীলপত্র উপস্থিত করে না; অথচ সে ভালরূপে অবগত আছে যে, দলীলপত্র উপস্থিত না করিলে উকীল একটি কথাও বলে না। পূর্বকালের এক সংসারবিরাগী দরবেশ লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক এক পর্বত গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং স্বীয় নির্ধারিত উপজীবিকা পাইবার আশায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া রহিল। এক সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। সুতরাং সেই ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। তখন তৎকালীন পয়গম্বরের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"অমুক ব্যক্তিকে বলিয়া দাও, সে-পর্যন্ত সে লোকালয়ে ফিরিয়া না আসিবে এবং মানুষের সহিত না মিলিবে সেই পর্যন্ত সে রিযিক পাইবে না।" সেই ব্যক্তি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলে চতুর্দিক হইতে তাহার নিকট উপঢৌকনাদি আসিতে লাগিল। ইহাতে তাহার মনে খটকা উপস্থিত হইলে আবার ওহী অবতীর্ণ হইল–"তুমি সংসারবিরাগ ও তাওয়াক্কুল প্রভাবে আমার হেকমত রহিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু তুমি বুঝ না যে, আমি স্বীয় বান্দাগণকে যে জীবিকা দিয়া থাকি তাহা আমার বান্দাগণের হস্ত দিয়া দেওয়াই অধিকতর পছন্দ করি।"

আবার দরজা বন্ধ করত নিজ গৃহে গুপ্তভাবে থাকিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জীবিকা পাইবার ভরসা রাখাও হারাম। কারণ, অপরিহার্য আস্‌বাব হইতে দূরে সরিয়া থাকা উচিত নহে। কিন্তু গৃহদ্বার বন্ধ না করিয়া তাওয়াক্কুল করিয়া থাকা জায়েয আছে; তবে ইহার শর্ত এই যে, দরজা দিয়া কেহ কিছু লইয়া আসিতেছে কি না উদ্বিগ্ন চিত্তে বারবার সেই দিকে দৃষ্টি না করা; মনকে মানুষের সহিত

আবদ্ধ না রাখিয়া আল্লাহ্‌র দিকে লাগাইয়া রাখা ও তাঁহার ইবাদতে সর্বদা মগ্ন থাকা এবং তৎসঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, যখন আসবাব হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করি নাই তখন জীবিকা অবশ্যই পাইব। এ-স্থলে বুযুর্গগণের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাঁহারা বলেন–"মানুষ জীবিকা হইতে পলায়ন করিলেও জীবিকা তাহার পিছনে পিছনে গমন করে এবং তাহাকে অনুসন্ধান করে। কেহ যদি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে–'হে আল্লাহ্, আমাকে জীবিকা দিও না', তবে তিনি তাহাকে বলেন–"হে নির্বোধ, আমি কি তোমাকে অনাহারে রাখিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? আমি তোমাকে আহার প্রদানে কখনও বিরত থাকিব না।"

যাহাই হউক, জীবিকা অর্জনের জন্য কার্যের উপকরণ–উপাদান পরিহার না করা, আবার উপকরণ-উপাদান অবলম্বনের কারণেই জীবিকা পাওয়া যায় বলিয়া মনে না করা, বরং বিশ্ব-কারণ একমাত্র আল্লাহ্ হইতেই সকলের জীবিকা পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা তাওয়াক্কুল। তবে তন্মধ্যে কতক লোক ভিক্ষার লাঞ্ছনার সহিত জীবিকা লাভ করিতেছে; আর কতক লোক প্রতীক্ষাজনিত কষ্ট ও পরিশ্রমে জীবিকা পাইয়া থাকে, যথা–ব্যবসায়ী। অপর এক শ্রেণীর লোক কঠিন পরিশ্রমে দেহপাত করিয়া জীবিকা ভোগ করিতেছে, যথা-বণিক ও শ্রমিক। আবার কতক লোক সম্মানের সহিত জীবিকা পাইয়া থাকে, যেমন–সূফী। সূফী ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে তাকাইয়া থাকে এবং জীবিকাস্বরূপ যাহা পাওয়া যায় তাহা আল্লাহ্‌র দিক হইতেই আসিতেছে বলিয়া বিবেচনা করে ও মানুষকে ইহার মধ্যবর্তী কারণ বলিয়াও মনে করে না।

তৃতীয় শ্রেণী–যে সকল উপাদান প্রাকৃতিক নিয়মে কার্যের অপরিহার্য কারণ নহে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় উহাদের আবশ্যকতা দেখা দেয়, যেমন ধনোপার্জনের জন্য কৌশলপূর্ণ চালাকি-চতুরতা অবলম্বন করা। রোগ দূর করিবার কার্যে মন্ত্র-তন্ত্র, ফাল, দাগ ইত্যাদির যেমন সম্বন্ধ, জীবিকা অর্জন ব্যাপারেও এই সকল চালাকি-চতুরতার তদ্রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের গুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা মন্ত্র-তন্ত্র ও দাগের ত্রিসীমায়ও গমন করে না। কিন্তু তাওয়াক্কুলধারী লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বনে উপার্জন করে না বা লোকালয় পরিত্যাগ করত বিজন অরণ্যে চলিয়া যায়–এইরূপ কথা তিনি কখনও বলেন নাই।

উপার্জন-কার্যে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণীবিভাগ- যাহাই হউক, উপার্জন-কার্যে তাওয়াক্কুলধারী লোকের তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**-নির্জনবাসী কামিল লোক। তাঁহারা বিনা সম্বলে বন-জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (র) তাঁহাদের কথাই বলিয়াছেন। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণী। যাঁহারা অনাহারে বা ঘাস-পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, এমন কি ঘাস-পাতাও পাওয়া না গেলে অনাহার-মৃত্যুভয়ে ভীত হন না, বরং ইহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যাহারা পাথেয় লইয়া পরিভ্রমণ করে তাহাদের সম্বলও অপহৃত ইহতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদেরও অনাহারে মৃত্যু ঘটিতে পারে। পথিমধ্যে সর্বদাই অসাধারণ ঘটনা ঘটিতে পারে। ইহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন করত সরিয়া থাকা ওয়াজিব নহে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**- জীবিকা অর্জনের জন্য এই শ্রেণীর লোক কোন শিল্পবাণিজ্য অবলম্বন করেন না অথবা বনে-জঙ্গলেও যান না, বরং লোকালয়ের কোন মসজিদ আশ্রয় করিয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা লোকের নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা করেন না; কেবল আল্লাহ্‌র দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। **তৃতীয় শ্রেণী**-এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলধারী লোক উপার্জনের জন্য গৃহের বাহিরে যান। তাঁহারা শরীয়তের বিধান অনুসারে উপার্জন করিয়া থাকেন এবং উপার্জন কার্যে কোন ছল-চাতুরি, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করেন না। যে-ব্যক্তি উপার্জন-কার্যে ছল-চাতুরি অবলম্বন করে এবং যে-ব্যক্তি রোগ দূরীকরণার্থ মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে ও উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা রোগীকে দাগ দেয়, তাহাদের উভয়েই সমতুল। তাহাদের তাওয়াক্কুল থাকে না।

উপার্জন হইতে বিরত থাকা তাওয়াক্কুলের শর্ত নহে। ইহার প্রমাণ এই যে,, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু পূর্ণ তাওয়াক্কুলধারী ছিলেন; তথাপি তিনি খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কাপড়ের বোঝা লইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ যাইতেন। লোকে নিবেদন করিল-"হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও কেন ব্যবসায় করেন?" তিনি বলিলেন-"আমি যদি নিজ পরিবারকে বিনাশ করি তবে অপর লোকেও বিনাশ করিয়া ফেলিবে।" তৎপর জনসাধারণ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য বায়তুল মাল হইতে বৃত্তি ধার্য করিয়া দিলে তিনি সর্বান্তঃকরণে একমাত্র খিলাফতের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার তাওয়াক্কুলের এই অবস্থা ছিল যে, ধনের প্রতি

তাঁহার মন একেবারে উদাসীন ছিল। তিনি যাহা কিছু পাইতেন ইহাকে তিনি স্বীয় অর্জিত ধন বলিয়া মনে করিতেন না; বরং ইহাকে আল্লাহর দান বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজের ধনকে অপর মুসলমানের ধন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া জানিতেন না।

সারকথা এই যে, অনাসক্তি ব্যতীত তাওয়াক্কুল হইতে পারে না। সুতরাং তাওয়াক্কুলের জন্য দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু অনাসক্তির জন্য তাওয়াক্কুলের আবশ্যকতা নাই। হযরত জুনায়দের (র) পীর হযরত আবূ জাফর হাদ্দাদ (র) অতি বড় তাওয়াক্কুলধারী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলিতেন-"আমি বিশ বৎসর পর্যন্ত স্বীয় তাওয়াক্কুল গোপন রাখিয়াছিলাম। বাজারে যাইয়া আমি প্রত্যহ একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করিতাম। কিন্তু ইহা হইতে হাম্মামখানায় গোসল করিবার জন্যও এক কপর্দক ব্যয় করিতাম না। বরং সম্পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।" হযরত জুনায়দ (র) স্বীয় পীরের সম্মুখে নিজ তাওয়াক্কুলের কথা প্রকাশ করিতেন না এবং বলিতেন-"পীর যে-মকামে উপনীত হইয়াছে, তাঁহার সম্মুখে সেই মকাম সম্বন্ধে বলিতে আমি লজ্জাবোধ করি।" (অর্থাৎ তাওয়াক্কুল বিষয়ে উভয়ে সমতুল্য ছিলেন।)

যে সূফী স্বীয় খানকায় নির্জনে বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার খাদেম তাঁহার জীবিকা সংগ্রহে বাহিরে যায়, তাঁহার তাওয়াক্কুল জীবিকা অর্জনে লিপ্ত লোকের তাওয়াক্কুলের ন্যায় দুর্বল। তাওয়াক্কুল শুদ্ধ হইবার অনেকগুলি শর্ত আছে। বিনা পরিশ্রমে জীবিকা পাইবার আশায় বসিয়া থাকা পূর্ণ তাওয়াক্কুল না হইলেও তাওয়াক্কুলের নিকটবর্তী বলা যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি কোন বিখ্যাত স্থানে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকে তাহাকে পেশাকারের সহিত তুলনা করা চলে এবং তাহার পক্ষে ভয়ের কারণ এই যে, লোকখ্যাতির দরুন তাহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার মন লোকখ্যাতির দিকে আকৃষ্ট না হইলে তাহার তাওয়াক্কুল জীবিকা অর্জনে লিপ্ত ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সদৃশ। তাহার তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে অল্প কথা এই যে, উপার্জন বিষয়ে লোকে যেন কোন সৃষ্ট জীবন ও উপকরণের উপর ভাবনা না রাখিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখে। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (র) বলেন-"আমি হযরত খিযির আলায়হিস্ সালামকে আমার সহিত অবস্থানে সম্মত পাইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত অবস্থান করিলে তাঁহার উপর ভরসা করিয়া আমার মন শান্তি লাভ করিতে পারে এবং তজ্জন্য

আমার তাওয়াক্কুল দুর্বল হইতে পারে, এই ভয়ে আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম।" হযরত ইমাম আহমদ হাম্বল (র) এক শ্রমজীবী দ্বারা কিছু কাজ করাইয়াছিলেন। শ্রমজীবীকে তাহার প্রাপ্যের কিছু অধিক দিবার জন্য তিনি তাঁহার ছাত্রকে আদেশ করিলেন। কিন্তু শ্রমজীবী অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন–'অতিরিক্ত অর্থ লইয়া শ্রমজীবীর পিছনে পিছনে গমন কর। হয়ত সে গ্রহণ করিতে পারে।" ছাত্র বলিলেন–"সে ত গ্রহণ করে নাই; এমতাবস্থায় তাহার পশ্চাতে যাইব কেন?" তিনি বলিলেন–"তখন হয়ত অতিরিক্ত অর্থের প্রতি তাহার লোভ জন্মিয়াছিল। এইজন্য সে গ্রহণ করে নাই। এখন হয়ত সেই লোভ বিদূরিত হইয়াছে; তাই গ্রহণ করিতে পারে।"

ফলকথা, এই–অর্জিত ধনের উপর ভরসা না করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভর করাই হইল উপার্জনকারী ব্যক্তির তাওয়াক্কুল। ইহার নির্দশন এই–ধন অপহৃত হইলেও তাহার মন বিমর্ষ হয় না এবং জীবিকা সম্বন্ধেও সে নিরাশ হয় না। কারণ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখে বলিয়া সে এইরূপ বিরূপ বিশ্বাস করে যে, তিনি তাহার জীবিকা এমন স্থান হইতে যোগাইয়া দিবেন যাহার কল্পনাও সে করে নাই। আবার আল্লাহ্ তাহাকে জীবিকা না দিলেও সে মনে করে, জীবিকা না দেওয়ার মধ্যেই তাহার মঙ্গল নিহিত আছে।

জীবিকা না দেওয়াতে মঙ্গল আছে, ইহা বুঝিবার মত মানসিক অবস্থা লাভের উপায়–কাহারও ধন চুরি গেল অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট হইল, অথচ তাহার মন বিন্দুমাত্র বিমর্ষ হইল না–পূর্ব অবস্থায় মন প্রশস্ত থাকিল, মনের এমন অবস্থা নিতান্ত দুর্লভ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। আল্লাহ্‌র পূর্ণ দয়া, অসীম অনুগ্রহ এবং পূর্ণশক্তির প্রতি যখন মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এমনকি সে বুঝিয়া লয় আল্লাহ্ এরূপ যে, তিনি বহু রিক্তহস্ত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা দান করিতেছেন; আবার বহু স্থলে সঞ্চিত ধনই ইহার অধিকারীর বিনাশের কারণ হইতেছে, সুতরাং এমন ধন বিনষ্ট হওয়াই মঙ্গলজনক–কেবল তখনই মানুষ সেইরূপ উন্নত মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"এইরূপ ঘটে যে, রাত্রিকালে মানুষ এমন কার্যের কল্পনা করে যাহা তাহার বিনাশের কারণ হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ আরশের উপর হইতে করুণার চক্ষে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন; ইহাতে তাহার সেই কার্য ঘটিতে পারে না। অতএব প্রাতঃকালে সে দুঃখিত

হইয়া সন্দেহ করিয়া বলে–'কে এবং কেন এই কার্য বিগড়াইয়া দিয়াছে?' সে মনে করে, তাহার প্রতিবেশী বিগড়াইয়া দিয়াছে অথবা তাহার চাচাত ভাই কিংবা অমুক ব্যক্তি ইহা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে সেই নিষ্ফলতার মধ্যে আল্লাহ্‌র করুণা মূর্তিমান রহিয়াছে।" এইজন্যই হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলিতেন–"আমি প্রাতঃকালে দরিদ্র কি ধনীরূপে শয্যাত্যাগ করিব, তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই ভয় করি না। কারণ আমার জানা নাই কোন অবস্থাতে মঙ্গল রহিয়াছে।"

পরিশেষে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শয়তানই মানব হৃদয়ে দরিদ্রতার ভয় ও সন্দেহের উদ্রেক করে। আল্লাহ্‌র বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ –

"অর্থাৎ শয়তান তোমাদের সহিত দরিদ্রতার অঙ্গীকার করিতেছে।" (সূরা বাকারাহ, ৩৭ রুকূ, ৩ পারা।) আল্লাহ্‌র সদয় দৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মারিফাতের পূর্ণতা। আবার এ-কথাও জানা আবশ্যক যে, জীবিকা অধিকাংশ সময়ে নিতান্ত গুপ্ত ও অজ্ঞাত আসবাবের মাধ্যমে আসিয়া থাকে। তাই বলিয়া এই গুপ্ত আসবাবের উপর ভরসা করা সঙ্গত নহে, বরং বিশ্ব-কারণ আল্লাহ্ সকলের জীবিকা দিবেন বলিয়া জিম্মাদার আছেন, ইহা উপরই ভরসা রাখা আবশ্যক। এক তাওয়াক্কুলধারী আবিদ কোন মসজিদে থাকিতেন। মসজিদের ইমাম তাঁহাকে কয়েকবার বলিলেন –"তুমি একেবারে নিঃস্ব-দরিদ্র। তুমি যদি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত।" আবিদ বলিলেন–"আমার এক ইয়াহূদী প্রতিবেশী আমাকে প্রত্যহ দুইটি রুটি দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" মসজিদের ইমাম বলিলেন–তাহা হইলে কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য না করাই সঙ্গত।" তখন আবিদ বলিলেন–"তোমার পক্ষে ইমামতি না করাই উত্তম। কেননা তোমার নিকট একজন ইয়াহূদীর জিম্মাদারী আল্লাহ্‌র জিম্মাদারী অপেক্ষা অটল ও মযবুত।" তদ্রূপ অপর এক মসজিদের ইমাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি কোথা হইতে আহার পাইয়া থাকেন?" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"একটু বিলম্ব করুন। আপনার পিছনে যে নামায পড়িলাম তাহা পুনরায় পড়িয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি। কারণ, আল্লাহ্ সকলের জীবিকার জিম্মাদার আছেন, এই কথার উপর আপনার ঈমান নাই।"

কল্পনাতীত স্থান হইতে জীবিকা লাভ–যাঁহারা উপরিউক্ত বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এমন স্থান হইতে জীবিকা পাওয়া যায় যাহার সম্বন্ধে কল্পনাও করেন নাই।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا –

অর্থাৎ "পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণকারী নাই যাহার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা নাই। আল্লাহ্‌র এই বাক্যের প্রতি তাঁহাদের ঈমান অত্যন্ত মযবুত।

হযরত হুযায়ফা মারআ'শীকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হযরত ইব্‌রাহীম আদহামের (র) মধ্যে কি গুণ দেখিয়াছিলেন যে, আপনি তাঁহার সংসর্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন?" হযরত হুযায়ফা (র) বলিলেন–"মক্কা শরীফে যাইবার পথে আমরা উভয়ে ভীষণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। আমরা কুফা শহরে উপস্থিত হইলে ক্ষুধার প্রতিক্রিয়া আমাতে প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'ক্ষুধায় কি তুমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ?' আমি বলিলাম–'হাঁ।' তখন তিনি আমাকে কলম, দোয়াত ও কাগজ আনিতে আদেশ করিলেন। আমি তৎসমুদয় আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি তৎপর লিখিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –

অর্থাৎ 'পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি'। ওহে, প্রত্যেক অবস্থায় তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য এবং তুমিই সকলের ধ্রুব লক্ষ্য। আমি তোমার প্রশংসা ও যিকির করিয়া থাকি এবং আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র। তোমার প্রশংসা করা, ধন্যবাদ দেওয়া ও যিকির করা–এই তিনটি কাজ আমার কর্তব্য। এইজন্য আমি দায়ী রহিলাম। অন্ন, পানি, বস্ত্র–এই তিনটি প্রদান করা তোমার কাজ। তুমি এই সবের জিম্মাদান।' এই কথাগুলি লিখিয়া কাগজখানা আমার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন–'ইহা লইয়া বাহিরে যাও' কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও দিকে মন লাগাইবে না, বরং প্রথমে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এই কাগজের টুকরা দিবে।" আমি বাহিরে আসিয়া এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার হস্তে সেই কাগজখানা দিলাম। তিনি ইহা পাঠ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন–'ইহার লেখক কোথায়?" আমি বলিলাম–'তিনি মসজিদে আছেন।' তখন তিনি ছয় শত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক থলিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি সেই উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি একজন খ্রীস্টান। আমি হযরত ইবরাহীম আদ্‌হামের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি বলিলেন–'এই থলিয়া স্পর্শ করিও না। অনতিবিলম্বেই ইহার মালিক আসিয়া পড়িতেছে।" বলিতে না বলিতেই উক্ত খ্রীস্টান ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত ইবরাহীম আদ্‌হামের (র) চরণ চুম্বনপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

হযরত আবূ ইয়াকুব বস্‌রী (র) বলেন–"আমি পবিত্র কাবাগৃহে দশ দিন অনাহারে থাকিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলাম এবং অবশেষে বাহির হইয়া আসিলাম। পথে একটি শালগম পতিত দেখিয়া ইহা কুড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিলাম। এমন সময়ে হৃদয়ের মধ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল–'দশ দিন অনাহারে থাকার পর তোমার ভাগ্যে কি একটা পচা শালগম মিলিল?' তখন শালগমটিকে সেই অবস্থায় পতিত রাখিয়া আমি পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে আগমন করিলেন এবং এক বাক্স তৈলে ভাজা রুটি ও তৎসঙ্গে মিছরী ও বাদাম শাঁস আমার সম্মুখে স্থাপনপূর্বক বলিতে লাগিলেন–'আমি সমুদ্র ভ্রমণে ছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ একদিন তুফান উঠিল। তখন আমি মান্নত মানিলাম–নিরাপদে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এই সমস্ত বস্তু আমি সর্বপ্রথমে যে-দরবেশকে দেখিতে পাইব তাঁহাকে দিব।' ইহা শুনিয়া আমি প্রত্যেক বস্তু হইতে এক এক মুষ্টি তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম–'আল্লাহ বায়ুকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন সে সমুদ্রে তুফান তুলিয়া তোমাকে আহার আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু তুমি অন্য স্থানে অন্ন খুঁজিয়া বেড়াইতেছ।" যাহাই হউক, এই ধরনের দুর্লভ কাহিনী শুনিলে মানুষের ঈমান বলবান ও মযবুত হইয়া থাকে।

পরিবারবিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুল–পরিবারবিশিষ্ট লোকের পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্বক বনে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করা উচিত নহে। পূর্ববর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের তাওয়াক্কুলই পরিবারবিশিষ্ট লোকের একমাত্র তাওয়াক্কুল। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, দুইটি গুণ না থাকিলে মানুষ

তাওয়াক্কুল করিবার উপযোগী হয় না। প্রথম–ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং যাহা কিছুই পাওয়া যাউক না কেন, এমনকি ঘাস-পাতা হইলেও উহা লইয়া পরিতুষ্ট থাকার অভ্যাস। দ্বিতীয়–ক্ষুধা সহ্য করা অদৃষ্টে থাকিলে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে উহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মানুষ নিজে এই দুইটি গুণ অর্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অপর লোককে এই বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে না। বরং মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিও বাস্তবপক্ষে তাহার পরিবারভুক্ত একজন স্বতন্ত্র সদস্যস্বরূপ। যে-ব্যক্তি ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না এবং ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়ে তাহার পক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিত্যাগ করত তাওয়াক্কুল করা উচিত নহে। কিন্তু পরিবারভুক্ত লোকেরাও যদি ক্ষুধা সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে এবং তাওয়াক্কুলের অনুমতি দেয় তবে উপার্জনে বিরত থাকা সঙ্গত হইবে। স্বীয় প্রবৃত্তি ও পরিবারভুক্ত অপর ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিজকে জোরজবরদস্তির সহিত ক্ষুধার্ত রাখা জায়েয আছে; কিন্তু পরিবারস্থ অপরাপর লোককে বাধ্য করিয়া ক্ষুধিত রাখা জায়েয নহে।

কামিল ঈমানদারের জীবিকা–কামিল ঈমানদার ব্যক্তি পরেহেযগারিতে লিপ্ত থাকিয়া উপার্জন না করিলে আপনা-আপনিই তাঁহার জীবিকার উপায় হইয়া পড়ে। যেমন মনে কর, মাতৃগর্ভে, শিশু উপার্জনে অক্ষম থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জীবিকা তখন নাভী-নাড়ীর সাহায্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভূমিষ্ট হইলে জননীর স্তন হইতে তাহাকে খাদ্য দিয়া থাকেন। সে দুধ ভিন্ন অন্য বস্তু খাইবার উপযুক্ত হইলে আল্লাহ্ তাহাকে দাঁত দান করেন। শৈশবকালে পিতামাতার মৃত্যুতে সে ইয়াতীম হইয়া পড়িলে আল্লাহ্প্রদত্ত যে স্নেহ-মমতার তাড়নায় পিতামাতা সন্তানকে উত্তমরূপে লালনপালন করিত, আল্লাহ্ তৎপ্রতি তদ্রূপ স্নেহ-মমতা অপর লোকের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেন। তখন সকলের মনই ইয়াতীমের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া উঠে। প্রথমে একমাত্র স্নেহময়ী জননী তাহাকে লালন-পালন করিত এবং এইজন্যই অপর লোকে শিশুকে জননীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর আল্লাহ্ বহু নরনারীকে তাহার লালন-পালনের জন্য উদগ্রীব করিয়া দিয়া থাকেন। শিশু বড় হইলে আল্লাহ্ তাহাকে জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা দান করেন এবং অর্জনের ইচ্ছা তাহার উপর চাপাইয়া দেন ও আত্মমমতা বোধ তাহার অন্তরে জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। এইজন্যই শৈশবে মাতৃস্নেহে যেরূপ দেহ রক্ষা পাইয়াছে, প্রাপ্তবয়সে

আত্মমমতা-বোধও তদ্রূপ কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীয় দেহ রক্ষার উপায় করিয়া লয়। কিন্তু আল্লাহ্ যদি তাহার উপার্জনের ইচ্ছা রহিত করিয়া দেন এবং তজ্জন্য সে একমাত্র তাক্ওয়া-পরহেযগারিতে নিবিষ্ট থাকে তবে সমস্ত জগতবাসীর হৃদয়ে তিনি তাহার প্রতি স্নেহ-মমতা জাগাইয়া দিয়া থাকেন। তখন সকলেই বলিতে থাকে–'এই ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে লিপ্ত আছেন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রদান করা উচিত।' যৌবনকালে আত্মমমতাবোধে সে একাই নিজের প্রতিপালনের উপায় করিয়া লইত, কিন্তু ইয়াতীমের প্রতি যেমন সকলেই দয়াবান হয় তদ্রূপ সকলেই এখন তাহার প্রতি দয়ালু হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি উপার্জনে সমর্থ হয়, অথচ আলস্যবশত উপার্জন না করিয়া বেহুদা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে লোকের মনে তাহার প্রতি দয়ার ভাব উদয় হয় না। তাওয়াক্কুল করত উপার্জনে বিরত থাকা এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে। কারণ, সে যখন স্বীয় প্রবৃত্তিতে নিবিষ্ট তখন নিজ প্রতিপালনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করাও তাহার পক্ষে আবশ্যক।

ফলকথা এই যে, মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট থাকিয়া স্বীয় প্রতিপালনের সকল উপায় অবলম্বনে বিরত থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা জগতবাসীর হৃদয় তৎপ্রতি দয়ার্দ্র করিয়া তোলেন। এইজন্যই কোন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তিকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে দেখা যায় না। বিশ্বরাজ্য পালনার্থ আল্লাহ্র কৌশলময় পরিপক্ক বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই–'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণকারী নাই যাহার জীবিকার ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত নহে'–আল্লাহ্র এই উক্তির মর্ম মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং বুঝিতে সমর্থ হয় যে, তিনি এমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, কোন প্রাণীই জীবিকার অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। জীবিকায় অভাবে কদাচিৎ কাহাকেও ধ্বংস হইতে দেখা গেলেও ইহাতেই তাহার মঙ্গল নিহিত আছে বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে, জীবিকা অর্জনে বিরত থাকার কারণে তাহার ধ্বংস হয় না। কারণ, অগাধ ধন উপার্জন করিয়াছে এমন ব্যক্তিকেও কখন কখন অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে দেখা যায়। এই ব্যাপারে হযরত হাসান বস্রীর (র) জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছিল বলিয়াই তিনি বলেন–"আমি চাই যে, বস্রার সকল অধিবাসী আমার পরিবারভুক্ত হউক এবং একটি গমের দানার মূল্য এক একটি স্বর্ণমুদ্রা হইয়া পড়ুক।" হযরত ওহাব ইবনুল ওয়ারদ (র) বলেন–"আকাশ লৌহনির্মিত এবং ভূতল কাঁসার হইলে জীবিকাপ্রাপ্তির উপায় না

দেখিয়া যদি আমার মন দুঃখিত হইত তবে আমি মুশরিক হইয়া যাইবার ভয় করিতাম।" আকাশে রিযিক বলিয়া আল্লাহ্ এইজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, জীবিকার উপর কাহারও হাত নাই।

কতক লোক হযরত জুনায়দের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–"আমরা আমাদের জীবিকা অন্বেষণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন–"জীবিকা কোথায় আছে জানা থাকিলে অন্বেষণ কর।" তাহারা আবেদন করিল–"আল্লাহ্র নিকট চাহিব।" তিনি বলিলেন–"যদি বুঝিয়া থাক যে, তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে তবে স্মরণ করাইয়া যাও।" তাহারা বলিল–"তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দেখি কি হয়।" তিনি বলিলেন–"পরীক্ষার জন্য তাওয়াক্কুল করিলে তিনি যে জীবিকা দিবেন, ইহাতে সন্দেহ করা হয়।" অবশেষে তাহারা নিবেদন করিল–"তাহা হইলে আমরা কি তদবীর করিব?" তিনি বলিলেন–"সকল তদবীর হইতে বিরত থাক।"

মোটের উপর কথা আল্লাহ্ যে জীবিকা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। রিযিক অন্বেষণকারীকে তাহার দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

দ্বিতীয় মকাম–যে-ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কার হইয়া পড়ে। কেননা সেই ব্যক্তি জীবিকার অদৃশ্য কারণ আল্লাহ্কে পরিত্যাগপূর্বক বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই বাহ্য বস্তুর উপর ভরসা থাকিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা হইবে কিরূপে? তবে যে-ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদরপূর্তির পরিমিত খাদ্য ও প্রয়োজনের সময়ে শরীর ডাকিবার উপযুক্ত বস্ত্র পাইয়া পরিতুষ্ট থাকে তাহার তাওয়াক্কুল অক্ষুণ্ন থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন–"চল্লিশ দিনের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে নষ্ট হইবে।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন–"পরিমাণে যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে।" হযরত আবূ তালিব মক্কী (র) বলেন –চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা করা না হয় তবে তাওয়াক্কুল হইবে না।"

হযরত বিশরে হাফীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত হুসায়ন মুগাযানী (র) বলেন–"একদা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট উপস্থিত

হইলেন। তিনি আমাকে একমুষ্টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার এরূপ খাদ্য সংগ্রহের আদেশ আমি কখনও শুনি নাই। আমি তাহার আদেশমত খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহার করিলেন। ইহার পূর্বে আমি তাঁহাকে কখনও অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে দেখি নাই। আহার শেষে দেখা গেল বহু খাদ্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অনুমতিতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করিলাম। হযরত বিশ্রে হাফী (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ?' আমি বলিলাম–'হাঁ।' তিনি বলিলেন–'আগন্তুক হযরত ফতেহ মওসেলী। তিনি মওসেল শহর হইতে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইয়া গেলেন যে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।"

যাহা হউক, বাস্তব কথা এই যে, অল্প আশা তাওয়াক্কুলের মূল। ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে। আবার সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত ধনকে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের ধনের ন্যায় মনে করিলে এবং সঞ্চিত সম্পদের উপর ভরসা না করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা পরিবারবিহীন একক লোকের সম্বন্ধে বর্ণিত হইল।

পরিবারের জন্য সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল–পরিবারবিশিষ্ট লোক এক বৎসরের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া দিতেন। পরিজনবর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি নিজের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যও জমাইয়া রাখিতেন না। অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইত না। কারণ, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও অপরের হস্তস্থিত ধনকে সমান মনে করিতেন। তবে সাধারণ লোকের মানসিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত এক সাহাবী